স ন্দী প ন সে ন

রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু বাঙালি জাতীয়তাবাদ

প্রথম অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও উনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজ

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ি খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎ সৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল;
ও সে জেতের দফা করলে রফা
মজালে তিন কুল।

অনেকেই জানেন, এ গান এক সময়ে কলকাতার লোকে পথেঘাটে গাইত, এমনকী ইস্কুলের ছেলেদের মুখে মুখে পর্যন্ত ঘুরত (শিবনাথ ৪৩)। এ গানে আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, যিনি সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করে তৎকালীন হিন্দু সমাজের বিরাগ ও সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। অবশ্য রামমোহন একা নন, এমন তীব্র ও অশালীন আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন তার প্রায় সিকি শতাব্দী পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও, যখন তিনি বিধবা বিবাহ চালু করতে চান। *হিতবাদী* পত্রিকায় ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু লেখেন:

> বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত; কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার এমনকি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত। (বিনয় ২৬৮)

এমন মনে করার কোনও কারণ নেই যে যাঁরা রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেছিলেন তাঁরা সবাই অশিক্ষিত, অসভ্য বা বর্বর ছিলেন। বরং, উলটোটাই

সত্যি— তাঁরা অনেকেই ছিলেন সে আমলের হিন্দু সমাজের মাথা, শিক্ষিত পণ্ডিত মানুষ। *সমাচার সুধাবর্ষণ* পত্রিকার ১২ নভেম্বর ১৮৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি কবিতার কথা উল্লেখ করে বিনয় ঘোষ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এমন অনেক পণ্ডিতের নাম যাঁরা বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেছিলেন, যেমন ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, গঙ্গাধর কবিরাজ, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ইত্যাদি (বিনয় ২৪৯)।

ঠিক তেমনি, রামমোহন রায়ের বিরোধিতা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন তৎকালীন বাংলার কয়েকজন প্রধান পুরুষ; যেমন শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজা রাধাকান্ত দেব — যিনি *শব্দকল্পদ্রুম*-এর প্রণেতা এবং বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র, বা রামকমল সেন—যিনি ছিলেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ এবং কেশবচন্দ্র সেনের ঠাকুরদা, কিংবা মতিলাল শীল—পরোপকার আর বদান্যতার জন্যে যিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। (শিবনাথ ৪৪-৪৬)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে প্রগতিবাদী চিন্তার পাশাপাশি কুসংস্কার, পশ্চাদ্‌গামিতা, অজ্ঞানতা, এবং অমানবিক লোকাচারের প্রতি এক ধরনের অচলা ভক্তি ছিল— যা এক অন্ধকার বিভীষিকার মতো আমাদের জাতীয় জীবনে জাঁকিয়ে বসেছিল। এই কুসংস্কারগ্রস্ত অচলায়তনের বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবিস্মরণীয় ভাষায়:

> রাজা রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও একপ্রকার অনির্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান— আমাদের হৃদয়ের দুর্বলতাই তাহাদের বল। (রবীন্দ্রনাথ চারিত্রপূজা ২২২)

বলা বাহুল্য, এ অজ্ঞানতার অন্ধকার একদিনে গড়ে ওঠে নি। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল আমাদের জানিয়েছেন, 'খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের পরবর্তীকালে বাংলার সমাজব্যবস্থা একটা প্রবল আলোড়নের সম্মুখীন হয়েছিল' (প্রশান্তকুমার প্রথম খণ্ড ৩) ।এ কথা ঠিক—অমর্ত্য সেন যেমন বলেছেন— মুসলিম বিজয়ের পরে হিন্দু ও মুসলমানরা 'বিভিন্নভাবে সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন' (অমর্ত্য ৫৬)। কিন্তু এও ঠিক যে হিন্দুদের এক বড়ো অংশ বরাবরই মানসিক সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে, নিজেদের মিথ্যে অহংকারের কারণে তারা সহজে মুসলমানদের সঙ্গে মিশতে পারে নি— উলটে আশ্রয় নিয়েছে নিজেদেরই সৃষ্ট এক গড্ডলিকায় যা তাদের ক্রমাগত অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে

নিয়ে গেছে। মধ্যযুগের মুসলিম পণ্ডিত আল বেরুনি এমনটাই লিখে গেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত নেতা যশবন্ত সিং তাঁর রচিত *Jinnah: India-Partition Independence* বইটিতে আল বেরুনির এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন:

> the Hindus believe that there is no country but theirs, no nation like theirs, no kings like theirs, no religion like theirs, no science like theirs. They are haughty, foolishly vain, self-conceited, and stolid. They are by nature niggardly in communicating that which they know, and they take the greatest possible care to withhold it from men of another caste among their own people, still much more, of course, from any foreigner. (যশবন্ত ১৬)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আল বেরুনির এই মন্তব্যের প্রায় নয় শতক পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও হিন্দুদের সংকীর্ণতা ও বিদেশি বা বিধর্মীদের সম্পর্কে তাদের সংশয় বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে কালিদাস নাগকে লেখা এক পত্রনিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> মুসলমানধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। (রবীন্দ্রনাথ *কালান্তর* ৬৭২)

শুধু তাই নয়, এ চিঠি লেখার প্রায় বারো বছর আগে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসে কৃষ্ণদয়ালের উক্তিতেও আমরা দেখি অন্য ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মের সংকীর্ণতার চেহারা:

> হিন্দু বললেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান হওয়া সোজা, খৃস্টান যে-সে হতে পারে—কিন্তু হিন্দু! বাস্ রে! ও বড়ো শক্ত কথা। (রবীন্দ্রনাথ *গোরা* ৬৪৪)

আল বেরুনি থেকে রবীন্দ্রনাথ—সুদীর্ঘ নশো বছর ধরে এক শ্রেণির হিন্দুদের মানসিকতার বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটে নি। এই সংকীর্ণতা ও অবিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে নিজেদের আলাদা করে রাখার এক প্রচেষ্টা—স্বাভাবিকভাবেই যা থেকে জন্ম হয়েছে এক বদ্ধ জলার, যে বদ্ধতার মধ্যে হিন্দু সমাজ যুগ যুগ ধরে আটকে ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে যেখানে উদার ক্ষেত্রে ফল ফলতে পারত সেখানে সর্বপ্রকার মুক্তির অন্তরায় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠে অস্বাস্থ্যকর নিবিড় জঙ্গল

হয়ে আছে' (রবীন্দ্রনাথ *চারিত্রপূজা* ২৪৩), তখন নিঃসন্দেহে তিনি এই অবিশ্বাসের বদ্ধ জলার প্রতিই দৃষ্টি রেখেছেন। আবার, এই রবীন্দ্রনাথই যখন লেখেন, 'যাহা মুখ্য বস্তু, যাহা সারপদার্থ, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া অনভ্যস্ত হইয়া যায় ... ... যাহা ত্যাজ্য, তাহাই পদে পদে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে' (রবীন্দ্রনাথ *চারিত্রপূজা* ২২৯), তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না যে অনুদার সমাজের আচারপ্রিয়তার কথাই তিনি বলতে চাইছেন। আচার ও বিধান হিন্দু সমাজে যে কী বিপুল ক্ষতি করেছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে *জাপান-যাত্রী*-র তিন নম্বর চিঠিতে আচার-সর্বস্ব হিন্দু যাত্রীদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচানো কারও সাধ্য নয়। কোনোমতে আখ চিবিয়ে, চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্ছে। (রবীন্দ্রনাথ *জাপান-যাত্রী* ১৫২)

বোঝা কঠিন নয়—এখানে রবীন্দ্রনাথ সেই সব হিন্দুদের কথা বলছেন যাঁরা ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে যাত্রাপথে অন্যের পাক করা খাবার খান না। এই আচারপ্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্রিটিশ-আগমনের ফলে এক নতুন ধরনের বঞ্চনা আর নিরাপত্তাহীনতার বোধ। বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন, নবাবি আমলের বাংলায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানরা সংস্কৃত-শিক্ষা করে কুলপুরোহিত বা সভাপণ্ডিত হয়ে কিংবা অধ্যাপনার কাজ করে 'কায়ক্লেশে জীবনধারণ করতেন', কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের হিন্দুরা আরবি-ফারসি শিখে সরকারি চাকরির যোগ্যতা অর্জন করতেন (বিনয় ৪৬-৪৭)।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই সুযোগও নষ্ট হয়ে গেল। 'সম্ভ্রান্ত' হিন্দু পরিবারের সন্তানরা সভয়ে আবিষ্কার করলেন যে আরবি-ফারসির আর কোনও মূল্য নেই—কারণ নতুন রাজভাষার শিরোপা পেয়েছে ইংরেজি, যা তাঁদের আয়ত্তে নেই। তখন তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়েছেন কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান পরিবারের সন্তান কার্তিকেয়চন্দ্র :

> বহু যত্নের ও পরিশ্রমের ধন অপহৃত হইলে, অথবা উপার্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক যে কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহা নির্ম্মূল হইয়া গেল। (বিনয় ৪৭)

এর ফলে প্রায় সর্বপ্রকারের হিন্দু বাঙালির দল শাসক-বৃত্ত থেকে নির্বাসিত হলেন, তাঁদের আশ্রয় হলো অবশেষে এক আচারসর্বস্ব বদ্ধ সমাজ, যে সমাজে তাঁরা তাঁদের শাসন চালাতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, এমন সমাজে সতীদাহ রোধ বা বিধবাবিবাহ চালু করার ক্ষেত্রে সমর্থন পাওয়া মুশকিল ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আচারের অত্যাচার' প্রবন্ধে লিখেছেন:

ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি নক্ষত্র দিন ক্ষণ লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া, কাহনকে কড়িতে ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমাত্র 'হিঁদু' হইব, মানুষ হইব না। (রবীন্দ্রনাথ *সমাজ* ৩৮৫)

এই আচারের দৌরাত্ম্যে যে হিন্দু সমাজের শক্তিক্ষয় কতখানি হয়েছিল তাও দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর *গোরা* উপন্যাসে:

কিন্তু সমাজের বন্ধনে, আচারের নিষ্ঠায়, ইহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে কিছুমাত্র বল দিতেছে না। ইহাদের মতো এমন ভীত, অসহায়, আত্মহিতবিচারে অক্ষম জীব জগতে কোথাও আছে কি না সন্দেহ। আচারকে পালন করিয়া চলা ছাড়া আর কোনো মঙ্গলকে ইহারা সম্পূর্ণ মনের সঙ্গে চেনেও না, বুঝাইলেও বুঝে না। (রবীন্দ্রনাথ *গোরা* ৮৯৭)

১৯১০ সালে প্রকাশিত *গোরা* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নায়কের মুখে যে কথা বসিয়েছেন, প্রায় অবিকল একই কথা তিনি নিজে লিখেছেন তার প্রায় উনিশ বছর পর প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' শীর্ষক রচনায়:

যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধ সংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা-দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি (রবীন্দ্রনাথ *কালান্তর* ৭১৬)

লোকাচার বা দেশাচারের শ্বাসরোধকারী শাসন ছাড়াও আরও অনেক উপদ্রব ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে ছিল—যেমন অশিক্ষা, কদাচার এবং অশালীন আমোদের উপদ্রব। ইংরেজ আমল শুরু হওয়ার পর সমাজে 'বিদ্বান' শব্দের সংজ্ঞা পালটে গেল। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'সামান্য ইংরেজি শিখে যাঁরা ইংরেজি বুলি কপ্‌চাতে শিখলেন, তাঁরাও বিদ্বান বলে গণ্য হতে লাগলেন' (বিনয় ৪৭)। সেকালের কলকাতা শহরে ইংরেজি শেখার আগ্রহ এতই মারাত্মক ছিল যে ডেভিড হেয়ার পথে বেরোলেই দলে দলে বালক তাঁর পালকির পেছন পেছন দৌড়ত—বলত, **'Me poor boy, have pity on me, me take in your school'**—এমনকী রামতনু লাহিড়িও না কি এমন ভাবেই হেয়ার সাহেবের পালকির পেছন পেছন ছুটে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন (শিবনাথ ৩০)। বলা বাহুল্য, অধিকাংশেরই ইংরেজি শেখার আগ্রহের মূলে ছিল চাকরি পেয়ে 'বাবু' হবার বাসনা—সত্যিকারের শিক্ষার লোভ তাদের ছিল না। এমনকী ইংরেজ শাসকও যে সত্যিকারের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিকে চাকরি দিতে চাইত না তা আমরা

বুঝতে পারি বঙ্কিম-লিখিত *মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত* থেকে—সেখানে হোম সাহেব যথার্থ ইংরেজি-শিক্ষিত চাকরি-প্রার্থীদের বলেন:

> ... we don't want quotations from Shakespeare and Milton and Bacon in the office. It is not the most learned man who is best fitted for this kind of work. So you can go, Baboo. (বঙ্কিমচন্দ্র ৫৪২)

ফলে, চাকরি পেতেন মুচিরাম গুড়ের মতো অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত এবং দুর্নীতিপরায়ণ লোকজন—যাঁরা চুরি, জোচ্চুরি, মিথ্যাচার ইত্যাদি করে 'ভারি রকম বাবু' হয়ে উঠতেন (বঙ্কিমচন্দ্র ৫৪৩)। বলা বাহুল্য, যে সমাজে এমন বাবুদের বাড়-বাড়ন্ত সে সমাজে সত্যিকারের নীতিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া কঠিন। এমন বাবুর সন্ধান আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' গল্পে, যেখানে দেখি গোপীনাথ 'ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ' হয়ে 'প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্তি' স্থাপন করতে থাকে।

আর এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল অশালীন আমোদ, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে বলেছেন 'অশিক্ষিত ধনিক শ্রেণীর আত্মপরিতুষ্টির নির্লজ্জ দম্ভপ্রকাশ' (সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালীঘাটের পট' ৯৩)। বাইনাচ, খেউড়, খ্যামটা এ সব তো ছিলই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল অশালীন বিকৃত রুচির উৎকট প্রকাশ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখে গেছেন যে দুর্গাপুজোর নবমীর দিনে 'বৃদ্ধ পিতামহ তাহার সমবয়স্কলোক, পুত্র পৌত্র লইয়া হাতে খাতা লইয়া কাদামাটির গান করিত। সে সব অতি অশ্লীল ও অশ্রাব্য গান ... ... তখনকার দিনে এ সবের প্রচলন ছিল এবং লোকে বিশেষ আপত্তি করিত না বরং আনন্দ অনুভব করিত' (সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলকাতার লোকসংস্কৃতি' ৪০)। ঊনবিংশ শতাব্দীর চারের দশকে *সম্বাদ ভাস্কর* পত্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠি হলো এ রকম:

> লজ্জার কথা কি কহিব গত শনিবার প্রাতে আমি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম তাহাতে দেখিলাম মাহেশ হইতে এক বজরা আসিতেছে, ঐ বজরাতে খেমটা নাচ হইতেছিল, তাহাতে আরোহি (য.) বাবুরা নর্ত্তকীদিগের নিতম্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এমত নৃত্য করিলেন, তাদৃশ নৃত্য ভদ্র সন্তানেরা করিতে পারেন না ... ... (বিনয় ১২৩)

আর এ ছাড়া, তথাকথিত 'ধার্মিক' হিন্দুদের আস্ফালন-প্রদর্শন তো ছিলই—যেমন তারা করেছিল রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে। এমনই এক ছবি আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে, যখন জগমোহনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা জিতে পুরন্দর 'ভোরবেলা হইতে ঢাকঢোল আনাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল' (রবীন্দ্রনাথ *চতুরঙ্গ* ১৩৮)।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের বেশ আগে থেকেই বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে—যে পরিবর্তন নিয়ে আসেন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা। সমকালীন

আচারসর্বস্ব হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি আর অচলায়তনের বিরুদ্ধে তাঁরাই প্রথম প্রতিবাদ করেন। হিন্দু কলেজের কেরানি হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে সে কলেজের ছাত্ররা—যাঁরা প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন আর 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিলেন—প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণের নিন্দা করতেন। তাঁদের এই আন্দোলনের ফলে হিন্দু সমাজে যে আলোড়ন গড়ে ওঠে তার বর্ণনা দিয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র:

> ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত; অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্ত্তে হোমারের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত। (শিবনাথ ৭১)

শুধু তাই নয়, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা *Athenium* (য.) নামে এক পত্রিকা বের করতে শুরু করেন যেখানে মাধবচন্দ্র মল্লিক লেখেন, 'If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism' (শিবনাথ ৬০)। তাঁদের সংস্কার-সংগ্রামের ধ্বনি হয়ে ওঠে 'Down with Hinduism' (বিনয় ২৪২)। বলা বাহুল্য, মুক্ত চিন্তায় শিক্ষিত হয়ে তাঁরা বদ্ধ ও অনুদার হিন্দু সমাজের মধ্যে ভালো কিছুই দেখতে পান নি। উৎসাহের আতিশয্যে তাঁরা হিন্দু সমাজের প্রচলিত আচার-বিরুদ্ধ কাজকর্ম করে সমাজে এক আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন—যার ফল তাঁদের পক্ষে সব সময়ে শুভ হয় নি। এমন এক ঘটনা ঘটে ১৮৩১ সালের ২৩ আগস্ট, যখন ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বন্ধুরা মুসলমানের দোকান থেকে হিন্দুর নিষিদ্ধ গরুর মাংস কিনে এনে তা খেয়ে হাড়গুলো প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে ফেলে দেন। এর পর পাড়ার হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যার ফলে কৃষ্ণমোহন বাড়ি ফেরার পর তিনি প্রতিবেশীদের আক্রমণের শিকার হন এবং অবশেষে তাঁকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। আলেকজান্ডার ডাফের কাছে আশ্রয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণমোহন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন (বিনয় ১০২-১০৩)। কোনও সন্দেহ নেই, নতুন আলোর বন্যায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। তবে এও ঠিক, মৃতপ্রায় হিন্দু সমাজকে বাঁচাতে গেলে এমন আঘাতের হয়তো প্রয়োজন ছিল। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—'Desperate times call for desperate measures'। ইয়ং বেঙ্গলদের তথাকথিত বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দু সমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন ... ... তাঁহাদের নিকট হিন্দু সমাজের

কিছুই ভালো কিছুই পবিত্র ছিল না; হিন্দু সমাজের যে-সকল কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের ভালোরূপ সৎকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণ মনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, প্রাচীন হিন্দু সমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে মদিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে-সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। (রবীন্দ্রনাথ *চারিত্রপূজা* ২২২)

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে যখন আমরা দেখি 'মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া' জগমোহন আর শচীশ মিলে 'ঘনিষ্ঠ রকমের হিতানুষ্ঠানে' লেগে পড়ে (রবীন্দ্রনাথ *চতুরঙ্গ* ১৩৭), তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না এই দুই চরিত্র-চিত্রণের পেছনে ইয়ং বেঙ্গলের ছায়া আছে।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রথম যুগের হিন্দু-বিরোধী আন্দোলনের ফলে খ্রিস্টান হবার হিড়িক বেড়ে গেছিল—যেমন হয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহনের আগে মহেশচন্দ্র ঘোষ আর পরে গোপীনাথ নন্দীও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন (বিনয় ১০৪)। খ্রিস্টান হবার এই হিড়িক থেকে ঠাকুরবাড়িও মুক্ত থাকে নি—পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলে তথা ভারতের প্রথম ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ১৮৫১ সালে কৃষ্ণমোহনের প্রভাবে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলেত যান তখন এই জ্ঞানেন্দ্রমোহনের ঠিকানাতেই তাঁর জন্যে পয়সাকড়ি পাঠানো হতো (সমীর ৭৮)।

শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে খ্রিস্টান হবার এই হিড়িককে রোধ করার চেষ্টা করেন রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁরই উদ্যোগে *হিন্দুহিতার্থী* বিদ্যালয় গড়ে ওঠে (দেবেন্দ্রনাথ ৩৯)। বস্তুত, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনকে বঙ্গদেশে খ্রিস্টান ধর্মের বাড়বাড়ন্ত রুখতেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১০ মাঘ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে এক ভাষণের শেষে তিনি ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে খ্রিস্টের ভাব আনতে নিষেধ করে বলেন:

খ্রীষ্টের নামে ইউরোপ শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে, দুর্ব্বল ভারতবর্ষে একবার আসিলে, তাহার অস্থিচর্ম্ম চূর্ণ হইবে। স্বাধীনতার বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই খ্রীষ্টধর্ম। (প্রশান্তকুমার প্রথম খণ্ড ১১৮)

এক হিসেবে দেখতে গেলে, খ্রিস্টান ধর্মের আক্রমণ থেকে দেবেন্দ্রনাথই হিন্দু সমাজকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টার মধ্যে কোনও জবরদস্তি ছিল না। কিন্তু অন্য অনেকেই সে জবরদস্তি করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে—রবীন্দ্রনাথের জন্মের অনেক আগে থেকেই—হিন্দু ধর্মের ওপর তথাকথিত 'আঘাত' রুখতে হিংসার

প্রকাশও দেখা দিয়েছিল, সে সামাজিক স্তরেই হোক বা পারিবারিক স্তরে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন রামমোহন রায় যখন রাস্তায় বেরোতেন তখন গোঁড়া হিন্দুর দল তাঁকে লক্ষ্য করে ইঁট, পাথর, কাদা ছুঁড়ে মারত আর গালাগাল দিত (শিবনাথ ৭২)। দ্বারকানাথ লাহিড়ী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর মা যে ছেলের 'বাইবেল প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র' পুড়িয়ে দিয়েছিলেন সে কথাও জানিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী (শিবনাথ ১৩)। রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথের সেজ ছেলে হেমেন্দ্রনাথের যখন বিয়ে হয় সাঁতরাগাছির হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে নীপময়ী দেবীর সঙ্গে, তখন ব্রাহ্মবিরোধীদের আক্রমণের আশঙ্কায় পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছিল (প্রশান্তকুমার প্রথম খণ্ড ৪৭)। এমনকী, ১৮৬২ সালের ১৩ এপ্রিল—রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন এক বছরেরও কম—ব্রাহ্মসমাজের নবীন নেতা কেশবচন্দ্র সেন যখন তাঁর কলুটোলার বাড়ি থেকে সস্ত্রীক জোড়াসাঁকোতে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ির দিকে যাত্রা করেছিলেন তখন তাঁকে বাধা দিতে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য লোক তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিলেন, এবং 'পাগড়ি-বাঁধা গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক' তাঁর বাড়ির ফটক আগলে দাঁড়িয়েছিল। শেষে ফটকের তালা ও খিল খুলে স্ত্রীকে নিয়ে কেশবচন্দ্র 'মুক্ত আলোবাতাসের মধ্যে' দাঁড়িয়েছিলেন (বিনয় ২২৭)। এ ঘটনার অর্ধশতাব্দীরও বেশি পরে *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেখান স্বামীর হাত ধরে বিমলা কেমন করে বাইরে বেরিয়ে আসে—এর সঙ্গে কেশবচন্দ্রর বিপ্লবের মিল চোখে পড়ার মতো।

শুধু হিংসার প্রকাশই নয়, রক্ষণশীল হিন্দুদল সর্বতো প্রচেষ্টা চালিয়েছিল সব ধরনের প্রগতিশীল সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে আচারের জাঁতাকলে সমাজকে পিষ্ট করতে। সনাতনপন্থী হিন্দু সমাজ কিছুতেই কোনোরকম সংস্কার মানতে প্রস্তুত ছিল না (সুমিত ২২০)। সংস্কার-বিরোধী মানসিকতার এক পরিচয় পাওয়া যায় যখন বিদ্যাসাগরের আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত কলেজের দরজা সব হিন্দুদের জন্যে খুলে দিতে পারেন না—উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চাপে ওই কলেজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছাড়া আর কোনও জাতের হিন্দুর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল (সুমিত ২২০)। রাধাকান্ত দেব, রাজনারায়ণ রায় এবং আশুতোষ দেব (যিনি ছাতুবাবু নামে বেশি বিখ্যাত) সতীদাহ নিবারণ করার বিরুদ্ধে বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে অ্যাপিল করেন (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ৫৮)। *বঙ্গবাসী* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বিহারীলাল সরকার শুধু যে বিধবা-বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন তাই নয়, হিন্দু সমাজে এই প্রথা জনপ্রিয় না হওয়াতে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন (সুমিত ২৩৪)। সুমিত সরকার জানিয়েছেন, বিদেশি শাসকদের হস্তক্ষেপ না মানার অজুহাতে এই সব গোঁড়া হিন্দুর দল ভয়াবহ রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন (সুমিত ৩০)। শুধু সতীদাহর মতো নির্মম প্রথা সমর্থন করা বা বিধবা-বিবাহর বিরোধিতা করাই নয়,

স্ত্রীশিক্ষার মতো তুলনায় নিরীহ বস্তুর বিরোধিতাও তাঁরা করেছিলেন। বিহারীলাল সরকার লিখেছিলেন হিন্দু নারীদের পড়াশোনা শিখিয়ে সমাজ বিষাক্ত হয়ে গেছে—তাঁর মতে পড়াশোনা শেখার চেয়ে হিন্দু নারীর উচিত স্ত্রীর কর্তব্য ভালো করে শেখা (সুমিত ২৩৪)। সেকালের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন:

যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;
আর কিছু দিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখ্‌তে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে। (শিবনাথ ১২৫)

স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি যে উপহাস আর অশ্রদ্ধার মনোভাব এখানে ফুটে উঠেছে সেই উপহাস আর অশ্রদ্ধার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটো গল্প 'খাতা'-য়, যেখানে বালিকা বধূ উমার তিন ননদ তার লেখাপড়া নিয়ে ব্যঙ্গ করছে, তার স্বামী তার লেখার খাতা কেড়ে নিচ্ছে—আর উমা লজ্জায় দুহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। শুধু এই ছবিই যে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন তাই নয়—নির্মোহ নির্মমতায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সতীদাহ-প্রথার শিকার মহামায়াকে, 'মহামায়া' গল্পে হাত-পা বেঁধে চিতায় তুলে দেবার পরও যে অলৌকিকভাবে বেঁচে দগ্ধ মুখ নিয়ে প্রেমিক রাজীবলোচনের ঘরে গিয়ে উঠেও শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারে নি; *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে দেখিয়েছেন হতাশ্বাস ননীবালাকে, বিধবার সংস্কার কাটিয়ে যে শেষ পর্যন্ত শচীশকে বিয়ে করতে না পেরে আত্মঘাতী হয়। হিন্দু সমাজ তার যাবতীয় শক্তি নিয়ে দুর্বল নারীদের আক্রমণ করেছিল, আর রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে তা আমাদের দেখিয়ে গেছেন—দেখিয়েছেন রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দুদের এক বড়ো অংশ কোনও প্রগতিবাদী ধারণাকেই মেনে নেয় নি। এই সনাতনপন্থী মানসিকতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও কুৎসিত প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৯১ সালে, যখন কলকাতার হরিমোহন মাইতি তার নাবালিকা স্ত্রী ফুলমণির সঙ্গে জোর করে সহবাস করার ফলে সেই বালিকা বধূর মৃত্যু ঘটে। এর পর প্রগতিশীল মহল থেকে 'সহবাস সম্মতি আইন' প্রণয়ন করার দাবি ওঠে। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুরা প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করেন ও হিন্দু জাতির গৌরব রক্ষার্থে মহিলাদের অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করতেই হবে—এমন নির্লজ্জ যুক্তিও দেন (সুমিত ২৩৮)। তনিকা সরকার যেমন বলেছেন, ঔপনিবেশিক শাসনে কোণঠাসা হতে হতে ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের সর্বশেষ শাসনক্ষেত্র হিসেবে যা দখল করে তা হলো 'গৃহের দাম্পত্য জীবন' (তনিকা ১৯৮), গৃহের নারীদের তারা কোনও স্বাধীনতাই দিতে চায় নি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিদ্যাসাগরের এক হৃদয়বিদারী খেদোক্তি, 'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা-বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না' (বদরুদ্দীন ২৭)।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে হিন্দু সমাজ বদ্ধ জলার রূপ ধারণ করে ছিল, রবীন্দ্রনাথের জন্মের বেশ কিছু সময় আগে থেকেই সেখানে পরিবর্তনের ছোঁয়াচ আসতে থাকে। পরিবর্তনের এই আলোড়নের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম। যতো দিন গেছে, ততোই তিনি হিন্দু সমাজের অচলায়তন ভাঙার চেষ্টা করেছেন, আর চেষ্টা করেছেন সে সমাজের অন্তর্নিহিত দোষ ও ক্ষতকে জনসমক্ষে এনে তার নিরাময় সাধন করতে।

এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন অনেকের মনেই সঙ্গতভাবে আসতে পারে—ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কতখানি হিন্দু ছিলেন? আমাদের সৌভাগ্য, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন। ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন' (রবীন্দ্রনাথ *চারিত্রপূজা* ২২৩)। তাঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই *ব্রাহ্মধর্ম* বইটির রচয়িতা, আর সেই দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হিন্দু সমাজের মধ্যে তিনি পরম দুর্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন' (রবীন্দ্রনাথ *চারিত্রপূজা* ২০৩)। অর্থাৎ রামমোহন আর দেবেন্দ্রনাথকে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বলেই জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা এও জানি—জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে হিন্দুধর্মের উপনয়ন প্রথা মানা হতো, এমনকী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই উপনয়ন হয়েছিল। আমরা এও মনে রাখতে পারি যে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুর তরফ থেকেই' কথা বলেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ *কালান্তর* ৭২৩)। আর তাই, রবীন্দ্রনাথের হিন্দু পরিচয় নিয়ে বিশেষ সংশয় থাকার কথা নয়। তবে, প্রশান্তকুমার পাল যেমন বলেছেন, পিরালী ব্রাহ্মণ হিসেবে ব্রাত্য হবার সুবাদে রবীন্দ্রনাথের পরিবার হিন্দু সমাজের 'আচার-বিধির কঠোর অনুশাসন ও কুসংস্কার' থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিল (প্রশান্তকুমার প্রথম খণ্ড ৩)। এ কথাও স্মরণযোগ্য যে ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট লেকচার দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'The unconventional code of life for our family has been a confluence of three cultures, the Hindu, Mohammedan and British' (রবীন্দ্রনাথ *রিলিজিয়ন অফ ম্যান* ১৬৮)।

এমন উদার পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠার জন্যেই হয়তো তৎকালীন হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতার কোনও আঁচ রবীন্দ্রনাথের ওপর পড়েনি। আর সে কারণেই হিন্দু সমাজের দুঃসহ নিষ্পেষণকে সমালোচনা করতে তিনি পরাঙ্মুখ হন নি—১৯০৯ সালের ৪ জানুয়ারি মাইরন ফেল্‌প্‌সকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজকে বর্ণনা করেন 'gigantic system of cold-blooded repression' হিসেবে (সুমিত ২৭)। সকল দৈন্যের দায় মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেবার যে প্রবণতা তার বিরুদ্ধেও তিনি

কলম ধরেছিলেন। *সাহিত্য* পত্রিকার পৌষ ১২৯৮ সংখ্যায় 'প্রত্নতত্ত্ব' শিরোনামে এক ব্যাঙ্গাত্মক প্রবন্ধে তিনি লেখেন:

> যখন এক সময়ে যবন ভারত অধিকার করিয়াছিল এবং নির্বিচারে বহুতর পূত মস্তক ও মন্দিরচূড়া ভগ্ন করিয়াছিল, যখন অনায়াসে যবনের স্কন্ধে সমস্ত দোষারোপ করা যাইতে পারে এবং সেজন্য কেহ লাইবেলের মকদ্দমা আনিবে না, তখন যে ব্যক্তি সভ্যতার কোনো উপকরণ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের দৈন্য স্বীকার করে সে পাষণ্ড, হৃদয়হীন, বিকৃতমস্তিষ্ক এবং স্বদেশদ্রোহী। (রবীন্দ্রনাথ 'প্রত্নতত্ত্ব' ১৯০)

মনে হয় না কি এই কথাগুলো যেন আজকের দিনের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রতি এক ব্যাঙ্গাত্মক কশাঘাত? মনে হয় না কি যে অযোধ্যাকাণ্ডের ঠিক এক শতাব্দী আগেই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এমন কোনও দিন আসবে যেদিন সব দায় ওই যবনদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে? বাজপেয়ী জমানার এন ডি এ সরকারের আমলে অতীত 'হিন্দু' গৌরব 'উদ্ভাবন' করে নটবর ঝা এবং এন. এম. রাজারাম *দি ডেসিফার্‌ড ইন্ডিয়ান স্ক্রিপ্ট* নামের এক বই লেখেন যেখানে 'সিন্ধু সরস্বতী সভ্যতা' নাম দিয়ে এক বিস্তৃত জালিয়াতি করা হয়। এ বইতে বলা হয়েছিল—বৈদিক সভ্যতার সংস্কৃত-ভাষী পণ্ডিতরাই সিন্ধু সভ্যতার নির্মাতা, আর এই বলে এই দুই লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে ভারতের আর্যরা আসলে বহিরাগত 'ইন্দো-ইউরোপীয়' নয়। এটা প্রমাণ করতে পারলে এই যুক্তি সাজানো যেত যে মুসলমানদের মতো সংস্কৃত-ভাষী আর্যরা 'বহিরাগত' নয়। কিন্তু এই জালিয়াতি অচিরেই ধরা পড়ে যায় (অমর্ত্য ৬২-৬৩)। রবীন্দ্রনাথের ওপরের কথাগুলো যেন সে কথা মনে রেখেই লেখা—যদিও লেখা হয়েছিল সে জালিয়াতির এক শতাব্দীরও বেশি আগে।

আর, 'প্রত্নতত্ত্ব' প্রবন্ধর শেষ কয়েকটি বাক্য পড়লে মনে হয় যেন সত্যি সত্যিই লেখা হয়েছিল আজকের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কথা মনে রেখে:

> আমরা হিন্দু, পৃথিবীতে আমাদের মতো উদার, আমাদের মতো সহিষ্ণু জাতি আর নাই। আমরা পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। অতএব আমাদের সর্বপ্রধান যুক্তি বাপান্ত, অর্ধচন্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ। (রবীন্দ্রনাথ 'প্রত্নতত্ত্ব' ১৯০)

আমাদের অনেকের ধারণা হলো, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের বৈরিতা শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনের পর থেকে—ব্রিটিশ শাসকদের 'ডিভাইড-অ্যান্ড-রুল' নীতির ফল হিসেবে। সে ধারণা যে কত ভুল তা আমরা বুঝতে পারি ভারতচন্দ্র রায়ের *অন্নদামঙ্গল* কাব্য থেকে। এ কাব্য রচিত হয় ১৭৫২ সালে, অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের পাঁচ বছর আগে—তখনও বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন গড়ে ওঠে নি। অথচ, এই *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ড 'অন্নদামাহাত্ম্য'-তে আমরা দেখি যে ভারতচন্দ্র লিখেছেন

'যবন' মুসলমান শাসকদের শিক্ষা দিতেই না কি কৈলাস-বাসী শিব বর্গিদের পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশে, যে বর্গিরা বাংলাদেশ ছারখার করে দিয়েছিল, শুধু মুসলমান শাসকই নয়—হিন্দু প্রজারাও যে বর্গিদের অত্যাচারে ত্রাহি-রব ডেকেছিল (মদনমোহন ৪০)। হিন্দু মানসিকতায় মুসলিম-বৈরিতার এই যে নিদর্শন আমরা পাই, পরবর্তীকালে তাই রূপ নেয় বিনায়ক দামোদর সাভারকারের 'হিন্দুত্ব'-র তত্ত্বে, যেখানে ঘোষণা করা হয় যে কেবলমাত্র হিন্দুরাই যথার্থ দেশপ্রেমিক হতে পারেন (সুমিত ৩৬২)। এই হিন্দু স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে যিনি রুখে দাঁড়ান তিনি—আর কেউ নন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু স্বাদেশিকতা—আদি পর্ব

রবীন্দ্রনাথের মেজদা তথা প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস অফিসার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর এক রচনায় আমরা প্রবল ইংরেজ-ভক্তির সন্ধান পাই। সে রচনার এক অংশ নিচে দেওয়া গেল:

> কত ইংরাজ কত বৎসর পরিশ্রম করিয়া জাহাজ নির্মাণ করিয়াছে, কত প্রাণ বলিদান দিয়া জাহাজ চালানো বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া স্বদেশের মঙ্গলার্থ এই দূর দেশে আসিয়াছে। আপনাদের অসাধারণ সহিষ্ণুতা, বুদ্ধি বিদ্যা ও বাহুবলে অসংখ্য অলংঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া এই ভারত মহাদেশে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, উহারা কেন এখানকার সমস্ত সুখ ভোগ করিবে না? এ সকল উহাদের বহুকষ্ট, বহুশ্রমের যথোচিত পুরস্কার বই আর কিছুই নহে। ইংরাজেরা যে দুর্গম পথ দিয়া এই সুখ-ভাণ্ডারে উপনীত হইয়াছে, আমাদের সম্মুখেও সেই পথ পড়িয়া রহিয়াছে। (জ্ঞানদানন্দিনী ৬১)

সেই 'সুখ-ভাণ্ডার'-এর পথ কী তাও জানিয়েছেন জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর এই রচনায়—লিখেছেন:

> বাণিজ্য কি কৃষিকার্য এর কোনটিতে আজও কোন ইংরাজ-আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয় নাই, তবে কেন আমাদের ধনীর ধন, কৃতবিদ্যদের বুদ্ধিবিদ্যা ও কৃষকের শ্রম মিলিত হইয়া আমাদের ক্ষেত্রে যথোচিত ফলোৎপাদন করে না? দেশীলোকের নির্মিত, দেশীলোক দ্বারা চালিত বাণিজ্যতরী কেন চারি সাগরের বক্ষে বিরক্ষণ করে না? শত শত ক্রোশ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কত কত বিদেশীরা ভারতে আসিয়া ... ... অপরিমিত অর্থ অর্জন করিতেছে, ভারতবাসীদের দরিদ্র দশা কেন ঘুচে না? (জ্ঞানদানন্দিনী ৫৬)

বোঝাই যায়, সে আমলের অনেক শিক্ষিত মানুষের মতো জ্ঞানদানন্দিনীও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের সঠিক চরিত্র জানতেন না—জানতেন না অন্যায় লুটপাট

আর ভারতবাসীকে নির্যাতন-নিষ্পেষণের মাধ্যমেই ইংরেজ প্রভু ভারতে একাধিপত্য কায়েম করেছিল, জানতেন না ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে চাইলেই ভারতীয়রা নিজের উদ্যোগে বড়োমানুষ হয়ে যেতে পারতেন না, জানতেন না ভারতীয়দের জন্যে পদে পদে ছিল বাধানিষেধ, এমনকী এও জানতেন না (অথবা তাঁকে জানানো হয় নি) যে তাঁর দাদাশ্বশুর প্রিন্স দ্বারকানাথ ওই 'বাণিজ্যতরী'-র ব্যবসা করতে গিয়েই ইংরেজ সরকারের অসহযোগিতার ফলে করতে পারেন নি (দেবব্রত ২৬)। পরাধীনতার গ্লানিবোধ যে সে আমলে শিক্ষিত মহলে খুব বেশি ছিল না তা এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়। গোপাল হালদার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> 'ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে'—'নিষ্কণ্টক ধর্মাচরণ করিবে'—ইংরেজের তৈরি করা এই Pax Britannica-র (মহারানীর রাজত্বের সুখশান্তির প্রশস্তি) বঙ্কিমের আমলে হিন্দু শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (গোপাল 'ভূমিকা' পঁয়তাল্লিশ)

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি শিক্ষিত মানুষের এই তদ্গত ভক্তিতে প্রথম ছেদ পড়ে ১৮৭০ এবং ১৮৮০-র দশকে, যখন বাংলার কৃষি-অর্থনীতিতে এক সংকট ঘনীভূত হয় যার ফলে কৃষকরা তো বটেই এমনকী যে-সব মধ্যস্বত্বভোগী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরাও ব্রিটিশ শাসনের উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয়ী হয়ে ওঠেন (হীরেন্দ্রনাথ ১৬)। এর ফলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। এ সময় থেকেই বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে—আমরা যে পরাধীন সেই বোধও জেগে ওঠে। এ হেন পরিস্থিতিতে পৃথিবীর সব পরাধীন দেশেই যা হয়েছে বা হয়ে থাকে বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষেও তাই হলো—শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ প্রভুদের শাসনের গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্যে আমাদের নিজেদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান শুরু হলো যাতে আমাদের দেশের লোক নিজেদের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে এক গভীর জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হতে পারে। পৃথিবীর সব পরাধীন দেশেই তাই হয়েছে—স্বজাতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্মরণ করে নিজেদের শক্তি বাড়ানো (পিটার ১৯২)। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'অতীতের গৌরবময় … …স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ' গড়ে তোলার প্রয়াস (রবীন্দ্রনাথ *আত্মশক্তি* ৩৯)। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই —অর্থাৎ ১৮৮০-র দশক থেকেই স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে জাতিগঠনের প্রয়াস শুরু হয়ে যায়।

অবশ্য, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে একধরনের স্বাদেশিকতার বোধ বরাবরই ছিল—একথাও স্মরণযোগ্য যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন তাঁর বাল্যকালে তাঁর বাবার শাসনে তাঁদের পরিবারে পরস্পরের মধ্যে ইংরেজিতে চিঠি লেখা 'অপমানজনক বলে গণ্য হত' (রবীন্দ্রনাথ *কালান্তর* ৭১৫), এটি নিঃসন্দেহে স্বাদেশিকতার বোধ

থেকেই উদ্ভূত। ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাতেই স্থাপিত হলো হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলা, যার জন্ম আদতে স্বাদেশিকতার বোধ থেকেই, এর ঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিল 'স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি করা' (প্রশান্তকুমার প্রথম খণ্ড ৬৮-৬৯)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পারসিবাগানে অনুষ্ঠিত এই হিন্দু মেলারই এক অধিবেশনে তেরো বছরের রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন (প্রশান্তকুমার প্রথম খণ্ড ১৯০)। তবে, এ কথাও মনে রাখতে হয়—গোপাল হালদার যেমন বলেছেন—হিন্দু মেলার উদ্যোক্তা রাজনারায়ণ বসু বা নবগোপাল মিত্রের কাছে 'হিন্দু' ও 'ন্যাশনাল' ছিল সমার্থক, তাঁদের কাছে 'ভারতবর্ষীয়ত্ব'-র মানেই ছিল 'হিন্দুত্ব' (গোপাল 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা' ১১৩)। আমরা এও জানি যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে এবং রাজনারায়ণবাবুর সভাপতিত্বে কলকাতা শহরের এক পোড়ো বাড়িতে 'স্বাদেশিকের সভা' নামে যে বালখিল্য স্বাদেশিকতার অ্যাডভেঞ্চার গড়ে উঠেছিল আর রবীন্দ্রনাথ যেখানে যোগ দিয়েছিলেন, সেখানেও দীক্ষা নিতে হতো 'ঋক্‌মন্ত্রে' (রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতি* ৪৯)—অর্থাৎ এখানেও 'স্বাদেশিকতা' বলতে 'হিন্দুত্ব'-ই বোঝানো হতো।

উনবিংশ শতাব্দীতে এভাবেই বাংলাদেশে স্বাদেশিকতা বলতে মূলত হিন্দু স্বাদেশিকতাই বোঝাত। এর কারণও সহজবোধ্য। যশবন্ত সিং যেমন জানিয়েছেন, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর ভারতীয় মুসলিম সমাজ আধুনিক শিক্ষা থেকে মুখ ঘুরিয়ে গোঁড়া মৌলবাদী চিন্তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ওঠে (যশবন্ত ২৭)। এ প্রসঙ্গে অবশ্য এ কথা অবশ্যই স্মরণীয় যে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে ভারতের মুসলমানরা যেমন করে যোগ দিয়েছিলেন, হিন্দুরা—বিশেষ করে হিন্দু বাঙালিরা—তেমন করে যোগ দেন নি। মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে টমাস মেটকাফ যেমন জানিয়েছেন, বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছিলেন হিন্দু সিপাইরা, কিন্তু তা থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করলেন মুসলমানরা (যশবন্ত ২৩)। বিদ্রোহ যখন ব্যর্থ হয়, দেশের মুসলমান জনগণের ওপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার, যে অত্যাচারের চরিত্র বোঝা যাবে ভারতের তৎকালীন বড়োলাট লর্ড ক্যানিংকে লেখা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোনের চিঠির একটি লাইন থেকে: 'every civil building connected with (the) Mohammedan tradition should be leveled (sic) to the ground without regard to antiquarian veneration or artistic predilection' (যশবন্ত ২৫)। ব্যর্থ বিদ্রোহী মুসলমান জনগণ যখন ব্রিটিশদের কুনজরে, বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণি কিন্তু তখন উত্থানের পথে—তাঁরা বিদ্রোহের পথে হাঁটেন নি। নরহরি কবিরাজ

এক নিবন্ধে দেখিয়েছেন, ১৮৫০ সাল পর্যন্ত বাংলার চাকরিজীবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের (যাঁদের প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন) হাতে সঞ্চয়ীকৃত অর্থের মোট পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৯০ লক্ষ পাউন্ড, আর এই বিশাল পুঁজির সমস্তটুকুই নিয়োজিত ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারি কাগজে (নরহরি ১৮৭)। বিদ্রোহে যোগ না দেবার কারণ এই তথ্য থেকে অনেকটাই প্রাঞ্জল হয়।

এ কারণেই বিদ্রোহ-পরবর্তী যুগে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরাই পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে বেশি করে আকৃষ্ট হন। ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলার সেনসাস্ রিপোর্ট উদ্ধৃত করে সাবির আলি জানিয়েছেন যে ১৮৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মোট ৪৮.৮ শতাংশ মানুষ ছিলেন মুসলমান যাঁদের মধ্যে মাত্র ২৯ শতাংশ ইস্কুলে পড়াশোনা করতেন—অপরপক্ষে মোট জনসংখ্যার ৫০.১ শতাংশ মানুষ ছিলেন হিন্দু যাঁদের মধ্যে ৭০.১ শতাংশ ইস্কুলে পড়তেন (সাবির ৫০৪)। পরিষ্কার বোঝা যায়, দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশিত হবার জন্যে যে ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল মুসলমানরা সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এ সমস্যা আরও বড়ো আকার পেল ১৮৮২ সাল থেকে যখন হান্টার কমিশনের সামনে নবাব আবদুল লতিফ বলেন উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির বাঙালি মুসলমানের জন্যে বাংলার বদলে উর্দু ভাষায় শিক্ষাদানই বিধেয়। এর ফলে রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির বাঙালি হিন্দুর নেতৃত্বে হিন্দু সমাজে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল মুসলমান সমাজে তা গড়ে উঠতে পারল না। বিনয় ঘোষও প্রায় একই কথা বলেছেন। পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণির বিপুল কলেবর বৃদ্ধির ফলেই যে বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবোধে 'হিন্দুত্বের সুর ও রং মিশে গেল'—এ কথা তিনিও বলেছেন (বিনয় ৩১৩)। বদরুদ্দীন উমর এ ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে:

> বাঙলা ভাষায় উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে আবদুল লতিফ এবং তাঁর মতো অন্যান্য সমাজ নেতারা একদিকে যেমন মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতি-চর্চার উদ্যোগ ও প্রসারকে বিনষ্ট করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষিত মুসলমান অর্থাৎ প্রধানত মধ্যশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন একটা বিচ্ছিন্নতার মনোভাব। এই মনোভাবের জন্যে দেশের মাটি, তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে তাঁরা নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বলে মনে করতে পারেননি। (বদরুদ্দীন ৩৬)

স্মরণ করা যেতে পারে, বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি আবদুল্লা রসুল ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার পারসিবাগানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'অতীতে [বাংলার] মুসলমানরা যে-দেশে থেকেছেন ও বড়ো হয়েছেন তার দিকে তাঁরা তাকান নি, তাকিয়েছেন ধর্মের দিকে' (রামকৃষ্ণ ৭২)।

এ থেকেই বোঝা যায় কেন বাংলাদেশে মুসলমানদের আগে হিন্দুদের মধ্যেই স্বাদেশিকতার প্রথম উন্মেষ হয়েছিল। ১৮৮০-র দশক থেকে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে জাতি-গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার সূচনা প্রকৃতপক্ষে হয়েছিল রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে হিন্দু সমাজে সংস্কারমুখী লড়াইয়ের মাধ্যমে, যার ফলে মুসলমানদের তুলনায় এ-ক্ষেত্রে হিন্দুরা অনেকখানি এগিয়ে গেছিল। বদরুদ্দীন উমর আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজকে উদ্ধার করার জন্যে কোনও বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হয়নি', যার ফলে মুসলমান সমাজ একধরনের কূপমণ্ডুকতাবোধে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল (বদরুদ্দীন ৫০)। কাজেই, একেবারে গোড়া থেকেই বাংলাদেশের স্বাদেশিকতা মূলত হিন্দু স্বাদেশিকতার রূপই পেয়েছিল—*আনন্দমঠ* উপন্যাসে দেশমাতৃকার কল্পনা-মূর্তির উদ্ভাবক ও উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় স্বদেশপ্রীতি ও হিন্দু-জাতীয়তা একাকার হয়ে গেছিল। এমনকী, জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবেও বঙ্কিম হিন্দু সংস্কৃতিকেই বুঝেছেন—গোপাল হালদারের ভাষায়: 'বঙ্কিম-কথিত জাতীয় সংস্কৃতিতে অ-হিন্দু ভারতীয়ের স্থান নগণ্য—অ-হিন্দুদের অস্তিত্বই যেন অজ্ঞাত' (গোপাল 'ভূমিকা' ছেচল্লিশ)। হিন্দু উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে যে জাগরণ ঘটতে শুরু করেছিল বঙ্কিম ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ ফসল, আবদুল লতিফের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে যে ফসল থেকে বাংলার মুসলিম সমাজ বঞ্চিত ছিল। তবে এও অবশ্যই আমাদের মনে রাখা উচিত—গোপাল হালদার যেমন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—ঋষি হিসেবে বঙ্কিমের হয়তো উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে তাঁর 'হিন্দুধর্মাশ্রয়ী' স্বদেশপ্রীতি মুসলমান সমাজের কাছে আদরণীয় হবে না, তাঁর এও উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে বন্দে মাতরম গানে 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'-জাতীয় পঙ্‌ক্তি মুসলমান সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, বিশেষত *আনন্দমঠ* উপন্যাসে যখন এ গান গাওয়া হচ্ছে 'যবন'-শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের গান হিসেবে। এ ছাড়াও, 'ম্লেচ্ছ', 'যবন' প্রভৃতি 'ঘৃণাব্যঞ্জক' শব্দের দ্বারা প্রতিটি মুসলমানই যে আহত হতে পারেন—এ কথাও বঙ্কিমের বোঝা উচিত ছিল বলে গোপাল হালদার জানিয়েছেন (গোপাল 'ভূমিকা' সাতচল্লিশ)। একদিকে আবদুল লতিফের কৃতকর্মের ফলে উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির বাঙালি মুসলমানের নিজের দেশ থেকে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব, অপরদিকে বঙ্কিমের চিন্তায় ও লেখনীতে স্বাজাত্যবোধ বলতে শুধুমাত্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদেরই কাহিনি—এই দুই কারণে ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে স্বাদেশিকতা গোড়া থেকেই হিন্দু-স্বাদেশিকতা হিসেবেই লালিত হয়ে উঠছিল।

১৮৭০ ও ১৮৮০-র দশকে বাংলাদেশের কৃষি-অর্থনীতিতে যে সংকট আসে তার অভিঘাত পড়ে শহুরে বাঙালিদের ওপরেও, ইংরেজ প্রভুদের ওপর শিক্ষিত

বাঙালিদের নিখাদ ভক্তিতে ছেদ পড়ে। এর ফলে এই সময়ে একদিকে যেমন দেশের শিক্ষিত মানুষ ইংরেজদের কাছে আবেদন-নিবেদনের জন্যে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন করেন—যার প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ সালে—ঠিক তেমনই তাঁদের একাংশ স্বজাতির অতীত গৌরব পুনরাবিষ্কারের মাধ্যমে দেশের সম্মান বাড়ানোর পথ বেছে নেন। এ কাজে এগিয়ে আসেন হিন্দুরাই, কারণ—যেমন আমরা আগেই দেখেছি—নানান কারণে সে সময়ে মুসলমানদের মধ্যে স্বাদেশিকতার বোধ সেভাবে গড়ে ওঠে নি। কাজেই, একে হিন্দু পুনরুত্থানের যুগও বলা যেতে পারে। এর ফল অনেক ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এই হিন্দু পুনরুত্থান প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত, এ জিনিস যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে তা অভ্রান্তভাবে অনুমান করেছিলেন লর্ড কার্জন। ১৮৯৯ সালের ২৬ জুলাই ম্যাক্স মুলারকে লেখা এক চিঠিতে কার্জন জানান:

> **There is no doubt that a sort of quasi-religious, quasimetaphysical ferment is going on in India, strongly conservative and even reactionary in its general tendency. The ancient philosophies are being re-exploited, and their modern scribes and professors are increasing in numbers and fame. What is to come out of this strange amalgam of superstition, transcendentalism, mental exaltation, and intellectual obscurity......who can say?** (নীরদচন্দ্র ২১-২২)

বঙ্গভঙ্গ-সহ অন্যান্য নানা কারণে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে কার্জন এক নিন্দিত চরিত্র—কিন্তু এ ক্ষেত্রে মনে হয় না সত্য বুঝতে তিনি বেশি ভুল করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে কার্জন এ চিঠি লিখেছিলেন, আর সেই দশকেই হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের একাংশের বিভিন্ন কার্যকলাপ দেখলে মনে হয় সমাজকে পেছনদিকে নিয়ে যেতে তাঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। মনে রাখতে হবে, সেই দশকেই—১৮৯১ সালে—সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে সমাজে অস্থিরতার সৃষ্টি হয় আর গোঁড়া হিন্দুরা নির্লজ্জভাবে নারী-বিরোধী অবস্থান নেন। এই আইনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আর পশ্চিম ভারতে হিন্দুদের মধ্যে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে—মধ্যশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে অনেকেরই মনোভাব ছিল 'চুলোয় যাক সমাজ-সংস্কার, আগে হিন্দু রীতিনীতি বাঁচাতে হবে', মারাঠি নেতা বাল গঙ্গাধর টিলক তাঁর সম্পাদিত *কেশরী* পত্রিকায় এই আইনের বিরোধিতা করেন (যদিও তার অর্থ ছিল বালিকা বধূদের দাম্পত্য ধর্ষণ ও মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া), এমনকী পুনা শহরে একদল হিন্দু যুবক সংস্কারপন্থীদের এক সভা আক্রমণ করে সভাগৃহের বিপুল ক্ষতিসাধন করে, আর বাংলাদেশের *বঙ্গবাসী* পত্রিকা লেখে এই

আইনের ফলে হিন্দু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল (জুডিথ ১৬২)। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল আমাদের জানিয়েছেন যে এই আইনের বিরুদ্ধে ১৮৯১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ময়দানে এক 'মহাসভা' হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় দুলক্ষ মানুষ, সে যুগের হিসেবে যা প্রায় অকল্পনীয় (প্রশান্তকুমার তৃতীয় খণ্ড ১৭৪)। তাছাড়া, এই দশকেই বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন কাশিমবাজারের জমিদারের সভাপণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, যিনি হিন্দু সমাজের হাঁচি-টিকটিকি প্রভৃতি সংস্কারের 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' দেন—এ ধরনের ব্যাখ্যা ছিল ঠিক তেমনটাই quasi-religious ও quasimetaphysical যেমনটা বলেছিলেন লর্ড কার্জন। এও মনে রাখা জরুরি যে সেই উনবিংশ শতকের শেষ দশকেই *বঙ্গবাসী* পত্রিকা নিপুণ ও উদগ্র আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কুৎসিতভাবে হিন্দু সমাজে সব রকমের প্রগতির—বিশেষ করে নারীশিক্ষার—বিরোধিতা করেছিল (প্রভাতকুমার *রবীন্দ্রজীবনী* ২০৬)। অর্থাৎ, সোজা কথায়, হিন্দু পুনরুত্থান যে প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল তা নিয়ে বিশেষ সংশয়ের অবকাশ নেই। আমরা এও স্মরণ করতে পারি যে *বঙ্গবাসী* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক যোগেশচন্দ্র বসু আর সে পত্রিকার লেখক চন্দ্রনাথ বসু—যিনি প্রগতি-পরিপন্থী রচনা লিখতেন—ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা 'পত্র'-র লক্ষ্য, যে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ খানিকটা তাঁর স্বভাবের বাইরে গিয়েই বেশ উগ্রভাবেই যোগেশচন্দ্র ও চন্দ্রনাথকে 'দামু' আর 'চামু' নামে সম্বোধন করে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তাঁদের প্রগতি-পরিপন্থী হিন্দুয়ানির সমালোচনা করেন (প্রভাতকুমার *রবীন্দ্রজীবনী* ২০৬)। সে কবিতার এক অংশ নিচে দেওয়া গেল:

দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
　　আরো হিঁদু চামু
সঙ্গে সঙ্গে গজায় হিঁদু
রামু বামু শামু—
　　　　(দামু আমার চামু!)
রব উঠেছে ভারতভুমে
　　হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন
　　ভয় নেইকো আর।
　　　　(ওরে দামু, ওরে চামু!)

পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর এই আক্রমণের ব্যাখ্যা জানিয়ে লেখেন, 'তাঁহার [চন্দ্রনাথের] অধিকাংশ মত যদি বর্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত

না হইত তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বাদ প্রতিবাদে আমার কখনই রুচি হইত না' (প্রশান্তকুমার তৃতীয় খণ্ড ১৯৬)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিন্দু পুনরুজ্জীবনের জিগিরে সে সময়ে বাংলার সমাজে অনেকেই *বঙ্গবাসী* পত্রিকার প্রগতি-বিরোধী চিন্তাকে সমর্থন করতেন—যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। তিনি লিখেছিলেন:

> পূজার্হ রামমোহন রায়ের মত 'বঙ্গবাসী'-ও আর একবার দেশরক্ষা করিয়াছে। আমরা যেরূপ ইংরাজী সভ্যতার স্রোতে বিজাতীয় পথে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, 'বঙ্গবাসী' চাবুক পিটাইয়া তাহার গতি কথঞ্চিৎ প্রতিরোধ করিয়াছে। (রামকৃষ্ণ ৬২-৬৩)

কাজেই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন যে চন্দ্রনাথের মত 'বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত', তখন সে দলে তিনি বোধ হয় নবীনচন্দ্রকেও ফেলেছিলেন। একইভাবে রবীন্দ্রনাথ শশধর তর্কচূড়ামণি এবং আরও এক হিন্দু পুনরুত্থান-পন্থী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তথা কৃষ্ণানন্দ স্বামীর সমালোচনা করেন তাঁর 'আর্য ও অনার্য' নাটকে যেখানে আমরা দেখি হাই তোলার সময়ে তুড়ি দেওয়া, পাখা দিয়ে বাতাস করার সময়ে গায়ে পাখা লাগলে তা মাটিতে ঠেকানো বা স্নানের আগে মাটিতে তৈলনিক্ষেপ করা ইত্যাদি সব ধরনের কুসংস্কারকে আধুনিক বিজ্ঞানের 'ম্যাগনেটিজম' তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যেমন করেছিলেন শশধর আর কৃষ্ণপ্রসন্ন (প্রশান্তকুমার তৃতীয় খণ্ড ৩০)।

তবে এমন বহুবিধ সমালোচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ নিজেও কিন্তু জাতির অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের পথে হেঁটেছিলেন, এবং হেঁটেছিলেন যথেষ্ট সফলভাবে। এই সত্যের দিকে আমাদের তাকাতেই হবে যে যাকে রবীন্দ্রনাথ 'হিঁদুয়ানি' বলে সমালোচনা করেছিলেন তেমন কাজ তিনি নিজেও করেছিলেন—একটা সময়ে তাঁকেও হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের দলে ফেলা যেত। ১৮৭৫ সালে মাত্র চোদ্দো বছর বয়সেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক *সরোজিনী*-তে রাজপুত বিধবা মহিলাদের জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করে 'সতী' হওয়ার ঘটনাকে গৌরবান্বিত করে গান লিখেছিলেন, যে গানে মুসলমান আক্রমণকারীদের 'যবন' বলেও উল্লেখ আছে। এ গানের কয়েক পঙ্‌ক্তি এ রকম:

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ—
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালিলি সবে
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার—
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।

শুধু 'সতী'-র গুণকীর্তন বা মুসলমানদের 'যবন' বলে সম্বোধনই নয়, এ গানে যবনদের 'প্রতিফল' ভুগতে হবে বলে এক ধরনের সাবধানবাণীও দেওয়া হয়েছে, অনুমান করা যায় যা হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের খুব পছন্দ হয়েছিল। বস্তুত, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার আমাদের জানাচ্ছেন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকের সাফল্যের পেছনে এই গানের অবদান অনেক (প্রশান্তকুমার প্রথম খণ্ড ২২৭)।

কেউ বলতেই পারেন যে মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি পুরোপুরি তৈরি হয় নি, আর তাই এই গানটিকে খুব গুরুত্ব না দেওয়াই বিধেয়। এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে ১৯০০ সালে প্রকাশিত *কথা* কাব্যগ্রন্থের 'বিবাহ' কবিতাতেও সতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। আর শুধু সতী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্যেই নয়, আরও অনেক কারণে রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রাথমিক পর্বের হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের দলে ফেলতে পারি। তবে সে বিষয়ে প্রবেশ করার আগে ১৮৮৫ সালের এক ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের মনে রাখা উচিত—সে বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, যদিও প্রথমদিকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা উচ্চ শ্রেণির ভারতীয়দের কিছু সুবিধের জন্যে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আবেদন-নিবেদনের পথই বেছে নিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তাঁদের মনে বিশেষ স্থান পায় নি। যেহেতু তৎকালীন কংগ্রেসি নেতাদের স্বাদেশিকতাবোধ অনেকাংশেই ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ, মুসলমান জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেন নি, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে। যশবন্ত সিং আমাদের জানাচ্ছেন যে ১৮৮৫ সালে তৎকালীন বোম্বেতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মোট বাহাত্তরজন প্রতিনিধির মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র দুই, আর তার পরের বছর কলকাতায় দ্বিতীয় অধিবেশনে সে সংখ্যা সামান্য বেড়ে হয় চারশো-একত্রিশজনের মধ্যে তেত্রিশ। এও মনে রাখতে হয়, যশবন্ত যেমন বলেছেন, এই মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউই তাঁদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন না। বস্তুত, ১৮৮৬ সালে কলকাতা অধিবেশনের আগে যখন কংগ্রেসের রিসেপশন কমিটি থেকে মুসলিম প্রতিনিধি বাড়ানোর জন্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তখন মুসলমান সমাজের নেতা সৈয়দ আহ্‌মেদ খান *আলিগড় ইনস্টিটিউট গেজেট*-এর ২৩ নভেম্বর ১৮৮৬ সংখ্যায় কংগ্রেসের আন্দোলনকে 'দেশদ্রোহী' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। পরের বছর ১৮৮৭ সালে তৃতীয় অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয় বদরুদ্দীন তায়েবজিকে, যার ফলে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল—এমনকী আলিগড়ের মহামেডান অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলেজের বহু ছাত্রের সেই অধিবেশনে যোগ দেবার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হলো। তাতে আশঙ্কিত হয়ে সৈয়দ আহ্‌মেদ খান ১৮৮৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর

এক প্রকাশ্য ভাষণে এই বলে হুঁশিয়ারি দেন যে মুসলমানরা যদি কংগ্রেসকে সমর্থন করে তবে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে (যশবন্ত ২৯)। বোঝাই যায়, ভারতের স্বাজাত্যবোধের চেহারায় হিন্দু জাতীয়তাবোধের প্রবেশ ভারতীয় মুসলমান সমাজে এক বিপুল অবিশ্বাস আর সন্দেহের জন্ম দিয়েছিল—যার খেসারত ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষকে নানাভাবে দিয়ে আসতে হয়েছে, এবং সে কথা বুঝেই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে হিন্দু পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্মবোধ করলেও খুব দ্রুত নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিপদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সতর্ক করে দেন।

তবে তার আগে রবীন্দ্রনাথ নিজেও হিন্দু জাতীয়তাবাদের দ্বারা বেশ কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ বলে যা উল্লেখ করা যায় তা একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা বা প্যামফ্লেট, যার নাম *মন্ত্রী-অভিষেক*। ১৮৯০ সালে এমারেল্ড হলে অনুষ্ঠিত Landholders' Association of Bengal-এর এক সভায় তিনি যে ভাষণ দেন, এই প্যামফ্লেট তারই লিখিত রূপ—প্রকাশিত হয় ১৮৯০-এর মে মাসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ ভাষণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সরকারি শাসনব্যবস্থায় আরও বেশি করে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে ব্রিটিশ প্রভুদের কাছে দরবার করতে। এই ভাষণের লিখিত রূপে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ যেন প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতাদের মতো করেই ভাবছেন—তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে আমরা নির্ভুলভাবে দেখি আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির ছাপ এবং ব্রিটিশ-ভক্তির পরিচয়। যেমন দেখি ইংরেজ শাসককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন:

> তোমরা স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগকে বৃহৎ অধিকার দিতে স্বীকার করিয়াছ এবং কিছু কিছু দিয়াছ। কিন্তু তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের আশ্বাস-অনুসারিণী অধিকারপ্রার্থনাকে তোমরা রাজভক্তির অভাব বলিয়া অত্যন্ত উষ্ণতা প্রকাশ কর। কিন্তু মনে মনে কি জান না ইহাতেই যথার্থ রাজভক্তি প্রকাশ পায়? (রবীন্দ্রনাথ *মন্ত্রী-অভিষেক* ২৮)

শুধু যে প্রথম যুগের কংগ্রেসি নীতির পরিচয়ই এ ভাষণে পাওয়া যায় তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের এ ভাষণে আমরা আরও দেখি হিন্দু জাতীয়তাবাদের এক অতি-সূক্ষ্ম সুর, যখন তিনি ব্রিটিশ শাসকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান যে মুসলমানদের একাংশের রাজভক্তি সন্দেহজনক:

> আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে একদল আছেন তাঁহারা কথা কহিতে চান না; যেটুকু কহেন তাহাতে এত অতিমাত্রায় রাজভক্তির আড়ম্বর যে তাহাতে তোমরাও ভোল না আমরাও ভুলি না ... ... তাঁহারা যেরূপ সাবধান চোরা মৌনভাব অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহারা যেরূপ গবর্নমেন্টের সকল কথাতেই অতিরিক্ত পরিমাণে স্কন্ধ-আন্দোলন করিয়া রাজভক্তির প্রচুর আস্ফালন করেন, সেইরূপ ভাবই কি তোমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান কর? (রবীন্দ্রনাথ *মন্ত্রী-অভিষেক* ২৯-৩০)

কোনও সন্দেহ নেই, এ লেখা পড়ে যে কারোরই মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে কংগ্রেসি নেতাদের মতো ব্রিটিশদের কাছে আবেদন করছেন তাই নয়, মুসলমান জনগোষ্ঠীর একাংশের যথার্থ রাজভক্তি নিয়েও সংশয় জানাচ্ছেন ব্রিটিশ প্রভুদের কাছে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর রচনাবলী থেকে এই লেখাটি বাদ দিয়েছিলেন (সব্যসাচী ৯০)—হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল এত বাড়াবাড়ি রকমের ব্রিটিশ-ভক্তির নিদর্শন তাঁর সঠিক ইংরেজ-বিরোধিতার ছবিকে ম্লান করে দিতে পারে।

এ সময়ের আরও অনেক লেখাতেই যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে আমরা হিন্দু পুনরুত্থানবাদের ইঙ্গিত পাই তা বলা বাহুল্য। ১৯০০ সালে প্রকাশিত *কথা* কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে যেমন হিন্দুযুগের প্রাচীন ভারতের গৌরবের ছবি আমরা দেখতে পাই, ঠিক তেমনই ১৯০১ সালে প্রকাশিত *নৈবেদ্য*-র কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রেও আমরা দেখি হিন্দু ঔপনিষদিক জগতের ছবি। বিশেষত, *কথা*-র 'বন্দী বীর', 'প্রার্থনাতীত দান', 'শেষ শিক্ষা' বা 'হোরিখেলা'-র মতো কবিতা পড়লে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতবাসী আর মুসলমান আক্রমণকারীদের মধ্যে কবি কোনও একটা ভেদরেখা টানছেন। নীরদ চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তাঁর ছোটোবেলায় মুসলিম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রাজপুত, মারাঠা বা শিখ জাতির বীরত্বের গাথা শোনানো হতো (নীরদ সি. ২৬৮)। রবীন্দ্রনাথের *কথা*-র অনেক কবিতাকেই সেই গোত্রে ফেলা যেতে পারে—অনুমান করা যায় হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের সেগুলো বেশ পছন্দ হয়েছিল। *নৈবেদ্য*-র কবিতাগুলিতেও আমরা দেখি 'নিরালম্ব ব্রহ্মজ্ঞান' (হরিদাস ও উমা ২২১)—যে কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের এক সময়ের বন্ধু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, যে ব্রহ্মবান্ধব নিজেই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীদের এক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক শাসনে দেশের প্রাচীন গৌরবগাথা স্মরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে প্রাচীন ভারতের যে ছবি নিজের মনোজগতে এঁকেছিলেন তা ছিল পুরোপুরি হিন্দু জগৎ, মুসলমানরা সেখানে নিতান্তই বহিরাগত। শুধু *কথা* বা *নৈবেদ্য*-ই নয়, সে সময়ে লেখা প্রবন্ধ থেকেও রবীন্দ্রনাথের এই মানসিকতার খোঁজ আমরা পাই। বস্তুত, এ সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের ব্রিটিশ-বিরোধী ভাবনা বীজ থেকে অঙ্কুরে পরিণত হয়—পরবর্তীকালে যা মহীরুহের আকার নেয়। ১৯০১ সালে তিনি বঙ্কিম-প্রতিষ্ঠিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা নতুনভাবে বের করতে শুরু করেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত করা। এই লক্ষ্যেই তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় অতি উৎসাহের সঙ্গে গোল্ডস্‌ওয়ার্দি লোয়েস ডিকিনসনের লেখা বই Letters from John Chinaman-এর সমালোচনা প্রকাশ করেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন চিনদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃত কুফল ভারতের মানুষের সামনে মেলে ধরতে

(কৃষ্ণা ও অ্যান্ড্রু ১৪২)। কিন্তু, ভারতীয়দের আত্মশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর কল্পনায় ছিল হিন্দু ভারত। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই বলে আক্ষেপ করছেন যে 'ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই' তা আসল ইতিহাস নয় (রবীন্দ্রনাথ *ভারতবর্ষ* ১২১), আর প্রকৃত ভারত সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা : 'প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের পথে বৈরাগ্যকঠিন দারিদ্রগৌরব শিরোধার্য করিয়া দুর্গম নির্মল মাহাত্ম্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিবার জন্য আমাদের ঋষি-পিতামহদের সুগম্ভীর নিদেশ-নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি' (রবীন্দ্রনাথ *ভারতবর্ষ* ১২৬)। এর আগে আষাঢ় সংখ্যার *বঙ্গদর্শন*-এও 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> এক সময় আমাদের হিন্দুত্ব গোপন করিবার, বর্জন করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা হইয়াছিল ... ... আজ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, যদি আমাদের সমাজকে পৈতৃক গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াই মহত্ত্বলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি, তবে তো আমাদের আনন্দের দিন। আমরা ফিরিঙ্গি হইতে চাই না, আমরা দ্বিজ হইতে চাই। (রবীন্দ্রনাথ *ভারতবর্ষ* ১৩৬)

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক আর বিংশ শতাব্দীর প্রথমে কয়েক বছর জুড়ে যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা হিন্দু পুনরুত্থানের ধারণায় আচ্ছন্ন ছিল তা বোধ হয় আমরা বুঝতে পেরেছি। হয়তো সে ধারণা ঠিক শশধর তর্কচূড়ামণি বা *বঙ্গবাসী*-র মতো নয়, কিন্তু ভারতীয় আদর্শ বুঝতে যে রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে মূলত হিন্দু আদর্শই বুঝতেন তা নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশই নেই।

আসলে, ১৮৮০-র দশক থেকেই বাংলাদেশে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের আবহ তৈরি হয়ে গেছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি উপন্যাস *রাজসিংহ* (১৮৮১) আর *আনন্দমঠ* (১৮৮২) এ কাজে প্রভূত গতিসঞ্চার করেছিল। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল অর্থনৈতিক ভাঁটার কারণে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত রোষ, যে রোষ হিন্দুদের নিজেদের গৌরবের অতীত-চর্চার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এও মনে রাখতে হয় যে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের কারণে সে সময়ের বাংলাদেশে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যাচর্চার বিরুদ্ধেও এক ধরনের জনমত গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর *আখ্যানমঞ্জরী* বা *চরিতাবলী*-তে কোনও ধর্মনেতাকে ঠাঁই দেন নি বলে বিহারীলাল সরকার তার মধ্যে 'কুশিক্ষা'-র বীজ দেখেছিলেন, আর বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তককে খোঁচা মেরে স্বামী বিবেকানন্দ প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন:

> ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, গোপাল অতি সুবোধ বালক—ওতে কোনো কাজ হবে না। ওতে বই ভালো হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোট ছোট গল্প

নিয়ে অতি সোজা ভাষায় ... ... কেতাব চাই। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে। (রামকৃষ্ণ ৩৬-৩৭)

এও মনে রাখতে হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব এবং কেশবচন্দ্র সেনের নব্য-অবতারবাদের অভিঘাতে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী আন্দোলনের অবস্থান অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন:

> উনিশ শতকের প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা এই সময় বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্বের সংস্কারকরা যতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন, হিন্দু ঐতিহ্যের ও নব-জাতীয়তার প্রবল জোয়ারের টানে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়। (বিনয় ৩১৭)

হিন্দু পুনরুত্থানের এই ঝোঁকের প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন তাঁর *গোরা* উপন্যাসে, যখন গোরা 'হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অনিন্দনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সংগ্রহ' করতে 'হিন্ডুয়িজম' নামের এক বই লিখতে বসে (রবীন্দ্রনাথ *গোরা* ৬৪৩), আর অবিনাশ গোরাকে 'হিন্দুধর্মপ্রদীপ' উপাধি দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়, কারণ 'আধুনিক ধর্মভ্রষ্টতার দিনে গোরাই' তার কাছে 'সনাতন বেদবিহিত ধর্মের যথার্থ রক্ষাকর্তা' (রবীন্দ্রনাথ *গোরা* ৮৮৪)। এ কথাও অনস্বীকার্য যে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে নিজের ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন প্রাচীন হিন্দু আদর্শকে অনুসরণ করেই সে ইস্কুলের নাম দেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম', এবং এমনকী সে ইস্কুলে প্রথম দিকে প্রাচীন হিন্দু রীতি অনুযায়ী বর্ণভেদও প্রচলিত ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পরের বছরে—১৯০২ সালে—'নববর্ষ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ প্রথাকে কার্যত সমর্থন করেই লিখেছিলেন, 'ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ শ্রেণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট বলিয়াই, উচ্চশ্রেণীয়েরা নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীকে লাঞ্ছিত করিয়া বহিষ্কৃত করে না' (রবীন্দ্রনাথ *ভারতবর্ষ* ১১৯)। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও যে প্রথম দিকে বর্ণভেদ প্রথা ছিল তা আমরা জানতে পারি কার্তিকচন্দ্র নানের এক চিঠি থেকে, যে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে কার্তিকচন্দ্র লেখেন:

> [ব্রহ্মবান্ধব] উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আপনি তখন বর্ণাশ্রমের ভিত্তির উপর আশ্রমটি গঠিত করেন। ছাত্রদের বর্ণ হিসাবে প্রাতঃসন্ধ্যার নিমিত্ত সাদা, বেগুনি, লাল ও হরিদ্রা রং-এর পট্টবস্ত্রের ব্যবস্থা হয় ও আপনিই তাহাদের "গুরুদেব" পদে অধিষ্ঠিত হন। সকলকেই গায়ত্রী পাঠের ও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার দেওয়া হয়। (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ৬২)

এ চিঠির প্রেক্ষিত অবশ্য ভিন্ন, ব্রহ্মবান্ধবের ছাত্র কার্তিকচন্দ্র এ চিঠিতে প্রমাণ

করতে চেয়েছেন যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা একযোগে ব্রহ্মবান্ধব ও রবীন্দ্রনাথ—একা রবীন্দ্রনাথ নন। সে বিতর্কে না ঢুকেও অন্তত এটা বলা যায় যে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধবের প্রভাবে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইস্কুলে অন্তত কিছুদিনের জন্যে বর্ণভেদের সূচনা করেছিলেন। গায়ত্রী পাঠ বা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যেও অবধারিতভাবে দেখা যায় হিন্দু স্বাজাত্যবোধের চেহারা।

তবে—বলা বাহুল্য—হিন্দু পুনরুজ্জীবনের এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন আটকে থাকেন নি। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের চরিত্রের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ চরিত্র—যা মুসলমান জনগোষ্ঠীকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলছিল। তখন থেকেই শুরু হয় রবীন্দ্র-ভাবনার জগতে এক নতুন পর্যায়, যখন তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। রবীন্দ্রনাথের এ পরিবর্তনের ছবি পাওয়া যায় তাঁরই সৃষ্ট গোরা চরিত্রের মধ্যে—*গোরা* উপন্যাসের প্রথম দিকে আমরা দেখি গোরা তার মা আনন্দময়ীকে বলছে, 'তোমার ঐ খৃস্টান দাসী লছমিয়াটাকে না বিদায় করে দিলে তোমার ঘরে খাওয়া চলবে না' (রবীন্দ্রনাথ *গোরা* ৬৩৫), আর উপন্যাসের শেষে সেই গোরাই তার মাকে বলে, 'এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে' (রবীন্দ্রনাথ *গোরা* ৯২৫)। তাঁর রচিত উপন্যাসের নায়ক যেমন হিন্দু জাত্যভিমান ভুলে বলে ওঠে, 'আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন' (রবীন্দ্রনাথ *গোরা* ৯২৩), ঠিক তেমনই রবীন্দ্রনাথ নিজেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন—আর নিপুণভাবে নিজের পরিবর্তনের ছবি এঁকে রেখেছেন তাঁর দিগ্‌বিজয়ী উপন্যাসের মধ্যে।

তৃতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু স্বাদেশিকতা—মধ্য পর্ব

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনে এক বড়োসড়ো পরিবর্তন দেখা দেয়, প্রকৃতপক্ষে যার বীজ নিহিত ছিল ঊনবিংশ শতকের শেষে হিন্দু পুনরুত্থানের মধ্যেই। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের যুগ অতিক্রম করে বাঙালি সমাজ তখন নব-গঠিত জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরে রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করছে, হিন্দু পুনরুজ্জীবনের ধাক্কায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবও বাঙালি সমাজে খুব বেশি আর নেই। এদিকে রাজনীতির জগতেও মতদ্বৈধতার প্রকাশ, যে মতদ্বৈধতার আঁচ পাওয়া যায় ১৯০৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে, যখন নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই লক্ষণ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল

যে শুধু আবেদন-নিবেদন নয়, ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে তার চেয়েও বেশি কিছু করতে হবে—আর সে কথা ভেবেই চরমপন্থীরা তাঁদের পথ স্থির করেন। এই পথে চলতে গিয়ে এই চরমপন্থীরা অনেকেই হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। নীরদ চৌধুরী যেমন আমাদের জানিয়েছেন, উনবিংশ শতকের শেষের দুই বাঙালি পুরুষ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ—মনেপ্রাণে রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। নীরদ চৌধুরী এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে বঙ্কিম যেমন তাঁর ধর্মবোধের কারণে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছিলেন, ঠিক তেমনই বিবেকানন্দও বলেছিলেন ভারতে একজন মানুষের উচিত সর্বাগ্রে আধ্যাত্মিক হওয়া, তারপর অন্য কিছু। তাঁরা দুজনেই নিজেদের ধর্ম—অর্থাৎ হিন্দু ধর্মকেই—ধর্মীয় সংস্কৃতির ভিত্তি বলে ধরে নিয়েছিলেন, এবং তাঁরা উভয়ে মিলে যে সংস্কৃতির পত্তন করেন তা বহুলাংশেই ব্রাহ্ম সমাজের উদার সংস্কৃতির পরিপন্থী (নীরদ সি. ২৪০)। এ কথাও অনস্বীকার্য যে বিশের শতকের প্রথম দশকে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ওপর বঙ্কিম ও বিবেকানন্দর প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাছাড়া, যেহেতু ঐতিহাসিক কারণে বাংলা তথা ভারতে মুসলমান জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটতে সময় লেগেছে, তাই বিশ শতকের গোড়া থেকেই চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক বড়ো অংশ—যাঁরা হিন্দু ছিলেন—বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রভাবে এসে হিন্দুত্ব এবং জাতীয়তাবাদকে সমার্থক ভাবতে শুরু করে দিলেন। এমন ভাবনা যে বাঙালি সমাজের শিক্ষিত অংশকে গ্রাস করে ফেলেছিল তা আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসে, যেখানে আমরা দেখি গোরা ত্রিবেণীতে স্নান করতে যায় এই সংকল্প নিয়ে যে সেখানে সে 'দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়' (রবীন্দ্রনাথ *গোরা* ৬৪৬)। কোনও সন্দেহ নেই, ত্রিবেণী শুধুমাত্র হিন্দুদেরই তীর্থক্ষেত্র, কিন্তু 'দেশ' বলতে গোরা শুধু হিন্দুদের দেশই বোঝে, আর তাই তার কাছে হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রই দেশের মানুষকে জানা বা বোঝার সবচেয়ে বড়ো মাপকাঠি। এমনকী, পরবর্তীকালে বাংলার রাজনীতিতে এই হিন্দুত্বের প্রভাব এতো মারাত্মক আকার ধারণ করে যে স্বদেশি যুগে স্বদেশি আন্দোলনকারীরা 'জাতিচ্যুত' করার ভয় দেখিয়ে অনিচ্ছুক মানুষকে [অবশ্যই যারা শুধু হিন্দু] তাদের দলে টানতে শুরু করেছিল (সুমিত ৩৬৬)—বোঝাই যায়, হিন্দু জাতীয়তাবোধ আর ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ধারণা এত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছিল যে অ-হিন্দু কারোর সেই বৃত্তে প্রবেশ খুবই কঠিন, অথবা অসম্ভব ছিল।

তবে স্বদেশি যুগ আরও পরে, তার একটু আগে থেকেই শুরু করা যাক। এ কথা অনেকেই জানেন যে আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে শিবাজি উৎসব এক অতি

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর পেছনেও ছিল সেই একই উদ্দেশ্য—দেশের প্রাচীন গৌরবগাথা স্মরণ করে বিদেশি ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। ১৮৯৫ সালে শিবাজির রাজধানী রায়গড়ে প্রথম এ উৎসব পালন শুরু করেন মারাঠি নেতা বাল গঙ্গাধর টিলক (রামকৃষ্ণ ৭৯)। লক্ষ্য ছিল মারাঠা বীর শিবাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করা। ১৯০২ সালে মারাঠি নেতা সখারাম গণেশ দেউস্করের উদ্যোগে কলকাতাতেও সেই শিবাজি উৎসব শুরু হয় (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ১৭০), আর তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪-এর শিবাজি উৎসব উপলক্ষে একটি কবিতাও লেখেন, যার নাম 'শিবাজীর দীক্ষা' (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ২০২-২০৩)। এই উৎসব নিয়ে বাঙালিদের একাংশের মনে যে কোনও দ্বিধা ছিল না তা কিন্তু একেবারেই নয়—কারণ মুসলমান সম্প্রদায় প্রথম থেকেই এই উৎসবে যোগ দেন নি। এর কারণ বুঝতে আমাদের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, শিবাজির বীরত্বের যে গাথা তা কিন্তু রচিত হয়েছে ওই মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধেই তাঁর লড়াইয়ের জন্যে, আর তাই শিবাজি উৎসবে মুসলমান সম্প্রদায়ের যোগদান স্বাভাবিক ছিল না। তাঁর আত্মজীবনী *অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান*-এ নীরদ চৌধুরী পরিষ্কার করেই জানিয়েছেন যে তাঁদের ছোটোবেলায় হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ ছিল যেহেতু মুসলমানরা একসময়ে হিন্দুদের ওপর শাসন করেছে। দেশের মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের যে এক রকমের নীরব ঔদাসীন্য ছিল, আর মুসলমান কৃষকদের প্রতি যে তাঁদের ঘৃণা-মিশ্রিত অবজ্ঞা ছিল, সে কথাও নীরদবাবু নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন। এছাড়াও রাজপুত, মারাঠা বা শিখ জাতির গৌরবগাথা যে স্মরণ করা হতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বীরত্বের জন্যই—সে কথাও তাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি (নীরদ সি. ২৬৮)। কাজেই, মারাঠা বীর শিবাজির নামাঙ্কিত উৎসবে মুসলমানদের যোগদান খুব স্বাভাবিক ছিল না, আর তাঁরা যোগ দেনও নি। এ কথাও আমাদের মনে রাখা জরুরি যে এই উৎসব ক্রমশ হিন্দু পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছিল—১৯০৬ সালের ৫ জুন পান্তির মাঠে (বিধান সরণির ওপর এখন যেখানে বিদ্যাসাগর হস্টেল অবস্থিত) এই উৎসব উপলক্ষে মূর্তি গড়ে ভবানী পুজো অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে হয়েছিল শুধু তাই নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সে উৎসবে যোগ দেন নি (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ৩০৯)। সে বছরেই রবীন্দ্রনাথ শিবাজি উৎসবকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে আখ্যা দেন (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ৩৪৬), যা থেকে বোঝা যায় এই উৎসবের প্রতি তাঁর প্রবল বিরক্তি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল মন্তব্য করেছেন যে স্বদেশী আন্দোলনকে হিন্দুরূপ দেবার 'প্ররোচনামূলক ও অদূরদর্শী প্রচেষ্টার সূত্রপাত এখানেই' (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ৩৪৬)।

তিনি এও জানিয়েছেন যে বঙ্কিমের *আনন্দমঠ* এবং *দেবীচৌধুরাণী* উপন্যাসের প্রভাবে পড়ে রাজনৈতিক ডাকাতি, গুপ্তসমিতিতে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবের চর্চা, আর *গীতা*-র 'মা ফলেষু কদাচন' বচনের 'নির্বেদাত্মক অশুভ ব্যাখ্যা' সর্বনাশকে 'ত্বরান্বিত করেছিল' (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ৩৪৭)।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রথমদিকে শিবাজি উৎসবের জন্যে কবিতা লিখেও শেষ পর্যন্ত তাকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে বর্ণনা করেছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা। আসলে, এ বিরক্তি গড়ে উঠেছিল ১৯০৬-এর জুন মাসের আগে থেকেই। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৪ চৈত্র, অর্থাৎ ১৯০৬-এর মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে বসে একটি কবিতা লেখেন, যার নাম 'বিদায়', আর যেটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাঁর *খেয়া* কাব্যগ্রন্থে। এ কবিতার প্রথম দুটি পঙ্ক্তি হলো:

বিদায় দেহো, ক্ষমো আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।

অনেকেই জানেন, এ কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গের পর। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'স্বদেশি আন্দোলন যখন সন্ত্রাসবাদের চোরাগলির দিকে পা বাড়াল, বাবা বুঝলেন তাঁর পথ স্বতন্ত্র' (রথীন্দ্রনাথ ৯২)। তবে, এ প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে পুর্বকথা আমাদের জানা প্রয়োজন।

১৯০৩ সালের জুন মাসে ভারতের তৎকালীন বড়োলাট লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন যে যেহেতু বঙ্গপ্রদেশের আয়তন খুব বেশি তাই প্রশাসনিক সুবিধের জন্যে সে প্রদেশকে দুভাগে ভাগ করা হবে (কৃষ্ণা ও অ্যান্ড্রু ১৪৩)। এ কথা ঠিক যে বঙ্গপ্রদেশ আয়তনে বেশ বড়ো ছিল, আর তাই প্রশাসনিক সুবিধের জন্যে সেই প্রদেশ বিভাগের যুক্তি খুব অসঙ্গত নাও মনে হতে পারে। কিন্তু কার্জন তথা ব্রিটিশ প্রভুদের উদ্দেশ্য যে ঠিক ততটা সরল ছিল না তা আমরা বুঝতে পারি যখন আমরা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনার দিকে তাকাই। সহজ বুদ্ধির হিসেবে উচিত ছিল যে বঙ্গভাষী অঞ্চলকে অখণ্ড রেখে বাকি অংশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কিন্তু তা না করে একদিকে অখণ্ড বাংলাদেশের হিন্দু-প্রধান পশ্চিমাংশ এবং অন্যদিকে অখণ্ড বাংলাদেশের মুসলমান-প্রধান পূর্বাংশকে বিচ্ছিন্ন করে এই দুই অংশকেই অন্যদের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হলো। অর্থাৎ সোজা কথায়, ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গভাষী অঞ্চলকে ভেঙে ফেলে উভয় প্রদেশেই বঙ্গভাষীদের সংখ্যালঘু করে দেওয়াই কার্জনের পরিকল্পনা ছিল। এর কারণও ছিল। বাঙালি জাতিকে হীনবল করাই তাঁর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। ১৯০৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকারের ভারত-সচিব ব্রডরিককে লেখা এক চিঠিতে কার্জন জানান:

বাঙালীরা নিজেদের একটা মহা জাতি মনে করে এবং তারা এমন একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যখন দেশ থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হয়েছে এবং জনৈক 'বাবু' কলকাতার লাট-প্রাসাদে অধিষ্ঠিত ... ... আমরা যদি দুর্বলতাবশতঃ তাদের হট্টগোলের কাছে নতি স্বীকার করি তবে কোনও দিনই আর বাংলার আয়তন হ্রাস বা বাংলার ব্যবচ্ছেদ সম্ভব হবে না। (এ পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে) আপনি ভারতবর্ষের পূর্ব-সীমান্তে এমন একটা শক্তিকে সংহত ও সুদৃঢ় করবেন যা এখনই প্রচণ্ড, এবং অদূর ভবিষ্যতে যা সুনিশ্চিতভাবেই ক্রমবর্ধমান অশান্তির উৎস হয়ে উঠবে। (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ১৭২-১৭৩)

কার্জনের নিজের চিঠি থেকেই পরিষ্কার, তাঁর বা ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ছিল বাঙালিদের ঐক্য নষ্ট করে তাদের হীনবল করে দেওয়া, যাতে তারা কোনওদিনই আর প্রবল পরাক্রমী ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা না করতে পারে।

কার্জনের বঙ্গচ্ছেদ পরিকল্পনা ও তাঁরই মস্তিষ্ক-প্রসূত ইউনিভার্সিটি বিল—যার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অধিকতর সরকারি কর্তৃত্বে আনা (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ৫৮)—এই দুইয়ের প্রতিবাদে ১৯০৪-এর ২২ জুলাই রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' নামে একটি ভাষণ পাঠ করেন (প্রভাতকুমার *রবীন্দ্রজীবনকথা* ৬৩)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৯০৪ সালে সখারাম গণেশ দেউস্কর *দেশের কথা* শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করেন যে বইতে ব্রিটিশ ভারতে 'দারিদ্র্য ও শিল্প-বাণিজ্যের অবনতির এক জীবন্ত চরিত্র' বর্ণিত হয় (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ২২৯)। 'স্বদেশী সমাজ'-শীর্ষক ভাষণের অন্যতম উপলক্ষ এই বইটিও ছিল (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ১৯৩)। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণের কথা লোকমুখে প্রচারিত হওয়ার ফলে জনমানসে যে কী প্রচণ্ড উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল আর কতো মানুষ যে সেদিন মিনার্ভা থিয়েটারে সেই ভাষণ শুনতে গিয়েছিলেন তার একটা হিসেব পাওয়া যায় এই তথ্য থেকে যে সে দিন প্রায় এক হাজার লোক সে ভাষণ শুনতে গিয়ে টিকিট না পেয়ে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলেন (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ১৯৪)। এর ফলে ৩১ জুলাই কার্জন রঙ্গমঞ্চে সেই একই ভাষণ আবার দিতে রবীন্দ্রনাথকে রাজি হতে হয়—আর মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে সে দিনেরও ১২০০ টিকিট বিক্রি হয়ে যায় (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ১৯৫)। এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনা করে বলেন:

পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ *আত্মশক্তি* ৪৭)

মোদ্দা কথা, তাঁর এ ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন রাজনীতিতে 'বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছলবলকৌশল সাজসরঞ্জামের' সমালোচনা করেন (রবীন্দ্রনাথ

আত্মশক্তি ৪৭), আর দেশের আত্মশক্তি জাগ্রত করার জন্যে 'জেলার মেলাগুলিকে' নতুন করে উজ্জীবিত করে 'হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন' করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন (রবীন্দ্রনাথ *আত্মশক্তি* ৪৮)। ইউরোপীয় রাষ্ট্র-চেতনার বদলে যে ভারতের নিজস্ব সমাজের শক্তি বাড়ানোর ওপরেই বেশি জোর দেওয়া উচিত, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, 'বৌদ্ধপরবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা কিছু আছে ও ছিল তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ *আত্মশক্তি* ৫৭), আর তাই তিনি নিজেদের শক্তিকে আবার জাগিয়ে তোলার কথা বলেন। এমনকী, বিদেশী শাসকদের আঘাত যে শাপে বর হয়েছে, এমন ইঙ্গিত দিয়েই তিনি বলেন, 'আমাদের যে শক্তি আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে' (রবীন্দ্রনাথ *আত্মশক্তি* ৫৮)।

বলা বাহুল্য, ঝানু এবং পোড় খাওয়া রাজনৈতিক নেতাদের এমনতরো কথা পছন্দ হয় নি। তাঁরা বরাবর ইউরোপীয় কায়দায় রাজনীতি করে এসেছেন, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বলে বসলেন যে ব্রিটিশ কায়দায় ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়ে কাজ হবে না—লড়তে হবে নিজেদের শক্তির ওপর ভর করে, আর তার জন্যে চাই নিজের সমাজের আত্মশক্তি। রাজনীতির নেতারা ভাবলেন, আগে নিজের শক্তি বাড়াব, তার পর স্বাধীনতার কথা ভাবব—এ তো ভালো বিপদ! তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এ পরিকল্পনাকে আকাশকুসুম ভেবে উড়িয়ে দিলেন, বুঝলেন না যে এ পথই হলো ঠিক পথ—রাজনীতির খেয়োখেয়িতে গেলে লাভের থেকে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি, ভারতীয় উপমহাদেশের পরবর্তী ইতিহাস আমাদের যা দেখিয়েছে। কাজেই শুরু হলো রবীন্দ্রনাথের প্রবল সমালোচনা। কৃষ্ণকুমার মিত্র *সঞ্জীবনী* পত্রিকার ২৭ শ্রাবণ সংখ্যায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখেন, 'রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় একজন শিক্ষিত লোকও রাজশক্তি, সমাজশক্তি ও আমাদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারেন, এবং আকাশকুসুম রচনা করিয়া তাহারই পশ্চাতে ধাবিত হইবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়' (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ১৯৮)। তবে রবীন্দ্রনাথ তো শুধু রাজনীতি-ব্যবসায়ীদেরই সমালোচনা করেন নি, করেছিলেন হিন্দু সমাজেরও—বলেছিলেন হিন্দুসমাজ 'নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে', আর তাই হিন্দু রাজনীতিবিদ্‌দের সমালোচনার লক্ষ্যও হয়ে উঠলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ প্রসঙ্গে *বঙ্গবাসী* পত্রিকায় বলাইচাঁদ গোস্বামী 'হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে' তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, তাঁর প্রবন্ধে বলাইচাঁদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সমুদ্র-যাত্রা (অর্থাৎ কালাপানি পার, হিন্দু মতে যা নিষিদ্ধ) প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চান, যার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌নৈপুণ্যের সঙ্গে বলেন, 'পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া

পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না' (রবীন্দ্রনাথ *আত্মশক্তি* ৬৩)। শুধু *বঙ্গবাসী*-র লেখকই নন, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেন হিন্দুত্বপন্থী রাজনীতিক সখারাম গণেশ দেউস্করও—স্বামী বিবেকানন্দের ভাই তথা ভারতের বামপন্থী চিন্তাবিদ্ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে সখারাম বলেছিলেন, 'কবিতা লিখিয়া ভারতোদ্ধার হইবে না' (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ২৩০)। প্রথম যুগের রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ-পাঠের পর 'রাজনীতিবিদ্‌রা কবির কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন' (প্রভাতকুমার *রবীন্দ্রজীবনকথা* ৬৩), আর পরের যুগের জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল আরও স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'গোঁড়া হিন্দুসমাজী ও রাজনীতিকদের বিরোধিতার জন্যই' রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ পরিকল্পনার অপমৃত্যু হয়' (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ১৯৯)।

তবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধিতার জন্যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের নাম চিরকালের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, গোঁড়া হিন্দু বা রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা যতোই তাঁর বিরোধিতা করুন না কেন। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর, যেদিন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর হয়, সেদিন তিনি কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদ-মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন। আর, যে কথা আমরা সকলেই জানি, অজস্র গান লিখে তিনি এই আন্দোলনকে 'ভাবের দিক থেকে ইন্ধন' জুগিয়েছিলেন (প্রভাতকুমার *রবীন্দ্রজীবনকথা* ৬৫)। প্রায় একমাস ধরে রবীন্দ্রনাথ তেইশটি দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন (কৃষ্ণা ও অ্যান্ড্রু ১৪৪), যেগুলি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার যথার্থই বলেছেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কবি 'চারণকবির ভূমিকা' নিয়েছিলেন (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ২৫৯)। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি এজরা পাউন্ড বলেছিলেন, 'গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতিকে গড়ে তুলেছিলেন' (কৃষ্ণ ১১৩)। গান্ধি-পূর্ববর্তী যুগে ভারতের কেউ যদি দেশের কোথাও কখনও অবিসংবাদীভাবে জনগণের নেতা হয়ে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ।

আমরা জানি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথ অচিরেই বিদায় নেন। তার একটা কারণ যদি হয় বয়কট নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের জবরদস্তির রাজনীতি, আরেকটা কারণ তাহলে অতি অবশ্যই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কুৎসিতভাবে হিন্দুত্বপন্থী রাজনীতির অনুপ্রবেশ। এই আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি জন্ম নেয়, আর মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে দুই ইংরেজ রমণীর মৃত্যু হয়। সে খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর সহযোগী কালীমোহন ঘোষকে ১৯ বৈশাখ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে এক চিঠিতে লেখেন:

> মজঃফরপুরে বম্ব ফেলিয়া দুইটি ইংরেজ স্ত্রীলোককে হত্যা করা হইয়াছে শুনিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আছে। এইরূপ অধর্ম ও কাপুরুষতার সাহায্যে দেশকে যাহারা

বড় করিতে চায় তাহাদের কিসে চৈতন্য হইবে জানিনা। কিন্তু তাহারা সমস্ত দেশকে বিষম দুঃখে ফেলিবে। ধর্মের মুখ চাহিয়া দুঃখ সহা যায় কিন্তু এমন পাপের বোঝা দেশ কি করিয়া বহন করিবে? (অলকরঞ্জন ২০)

ওই একই বছরে—অর্থাৎ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে—'দেশহিত' প্রবন্ধে আরও স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রকৃতির সমালোচনা করেন:

রাজার সন্দেহ জাগ্রত হইয়া আমাদের চারি দিকে যে শাসনজাল বিস্তার করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আমরা সর্বদা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না।

এই প্রবন্ধে তিনি আরও লেখেন, 'আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন, দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে।' এ ছাড়াও তিনি আন্দোলনের নামে 'অন্যায়' ও 'উচ্ছৃংখলতা'-র নিন্দা করেন, ও যারা 'জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া' জাতিকে গড়ে তুলতে চাইছেন তাদের কঠোর সমালোচনা করেন (রবীন্দ্রনাথ *পরিশিষ্ট* ৩৬০)।

আমরা স্মরণ করতে পারি, *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অবিকল একই ভঙ্গিতে স্বদেশি আন্দোলনের সমালোচনা করেন। এই আন্দোলন পথভ্রষ্ট হয়ে উচ্ছৃংখলতায় পর্যবসিত হয়ে যেভাবে নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার হয়ে নেমে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এই উপন্যাসে—যখন দেখি মুখে 'বন্দে মাতরং' বুলি আওড়ানো তথাকথিত স্বদেশি বিপ্লবীবর্গ বিলিতি কাপড় পোড়ানোর নাম করে নিরীহ প্রজা পঞ্চুর (যে বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিল) আর্থিক ক্ষতিসাধন করে, তার ওপর অন্যায় জরিমানা ধার্য করে, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে জুতোপেটাও করে (রবীন্দ্রনাথ *ঘরে বাইরে* ৬৬-৬৭)। যেভাবে এই স্বদেশি আন্দোলন দেশের মানুষেরই সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন ১৩১৫ বঙ্গাব্দেই প্রকাশিত 'সদুপায়' প্রবন্ধে:

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই ... ... অল্পদিন হইল মফঃস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি, সেখানকার কোন-একটি বড়ো বাজারের লোকে নোটিস পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে সেইসঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ সমূহ ২৮৫)

ঘরে বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশ স্বদেশি বিপ্লবীদের জোর-জবরদস্তি ও ভীতি-প্রদর্শনের নিন্দা করে বলছে, 'দেশের জন্য অত্যাচার করা দেশের ওপরেই অত্যাচার করা' (রবীন্দ্রনাথ *ঘরে বাইরে* ৬৮)। দেশের ওপর অত্যাচার বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আমরা স্মরণ করি 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ *রাজা প্রজা* ২৪০)। চোরাগোপ্তা সন্ত্রাসবাদ যে জাতির জীবনে অমঙ্গল ডেকে আনবে সে কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> যখন দেখা যায়, কোনো একটা বিশেষঘটনামূলক উত্তেজনার তাড়নায়, একটা সাময়িক বিরোধের ক্ষুব্ধতায় দেশের অনেক লোক সহসা দেশের হিত করিতে হইবে বলিয়া এক মুহূর্তে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হয় নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, হৃদয়াবেগকে একমাত্র সম্বল করিয়া তাহারা দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেশের সুদুর ও সুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকে শান্তভাবে সত্যভাবে বিচার করিতে অবস্থাগতিকেই অক্ষম। (রবীন্দ্রনাথ *রাজা প্রজা* ২৩৫)

কথা হলো, স্বদেশি নেতারা এমন কাজ করেছিলেন কেন, আর রবীন্দ্রনাথই বা এমন সমালোচনা করেছিলেন কেন? এর উত্তর হলো—দেশের অনেকেই বিলিতি দ্রব্য বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে চায় নি, আর তাই তাদের জোর করে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করা হয়েছিল, যেমন আমরা আগেই দেখেছি হিন্দুদের 'জাতিচ্যুত' করার ভয় দেখিয়ে বয়কটে সামিল হতে বাধ্য করা হয়েছিল, বা *ঘরে বাইরে*-র পঞ্চুর মতো অনিচ্ছুকদের অন্যায় সাজা দেওয়া হয়েছিল। বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে বিশেষ করে গরিবের আপত্তি ছিল, কারণ বিলিতি জিনিসের বদলে দেশি জিনিসের কারবার করলে তাদের ক্ষতি হতো—যেমন দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ *ঘরে বাইরে*-তে (রবীন্দ্রনাথ *ঘরে বাইরে* ৬৫)। গবেষক সুমন্ত ব্যানার্জি আমাদের জানিয়েছেন যে বিলিতি জিনিস দামে কম ছিল আর বেশি টেকসইই ছিল (সুমন্ত ব্যানার্জি ১৪২)। কাজেই গ্রামের গরিব সাধারণ মানুষ হাটে বাজারে বিলিতি জিনিসের কারবারই করতে চাইত, যার জন্যে গরিব মানুষকে কখনওই দোষ দেওয়া যায় না। আর তার সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে দেশি জিনিসের দাম মওকা বুঝে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে উদ্ধৃত করে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আমাদের জানিয়েছেন:

> বাঙ্গালা যেমন বিলাতী কাপড় বর্জন সঙ্কল্প করিল, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা তেমনি কাপড়ের মূল্য বাড়াইয়া দিয়া সেই সুযোগে লাভবান হইতে লাগিলেন। তাঁহারা

কাপড়ের মূল্য এত অধিক বাড়াইয়া দিলেন যে, তাঁহাদিগকে সঙ্গত লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে অনুরোধ করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ [বন্দ্যোপাধ্যায়] প্রমুখ নেতারা উপেন্দ্রনাথ সেন ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে বোম্বাইয়ে পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা বলিলেন, বাঙ্গালা যদি ভাবাবেগে নির্ব্বোধের মতো কার্য্য করে, তবে ব্যবসায়ীরা সেই সুযোগে লাভ করিতে বিরত হইবে কেন? (রামকৃষ্ণ ৭২-৭৩)

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ব্যবসায়ীদের মানসিকতা একেবারেই সরল—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য লাভ করা, আর তাই এ ক্ষেত্রেও তাঁরা তাই করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বিদেশি দ্রব্য বয়কট বা নেতাদের গরম গরম ভাষণ—কিছুই তাঁদের সেই লক্ষ্য থেকে বিরত করতে পারে নি। স্বদেশি নেতারাও নিজের দেশের ব্যবসায়ীদেরই বোঝাতে পারেন নি। অন্ধের মতো ভাবাবেগের বশে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যে নিজের দেশ বা নিজের সমাজের শক্তিকেই গড়ে তুলতে হয়—রবীন্দ্রনাথের এ চিন্তা যে কতোখানি সঠিক ছিল তা আমরা এই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বদেশি যুগের প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ সিপাহি বিদ্রোহের সময়েও কিন্তু গরু-শুওরের চর্বি নিয়ে যে কেলেংকারি হয়েছিল তার মূলে ছিল ব্যবসায় লাভ করার লক্ষ্য। লন্ডনের *দি টাইম্‌স্‌* পত্রিকার তৎকালীন কলকাতা-স্থিত রিপোর্টারকে উদ্ধৃত করে অনিরুদ্ধ রায় আমাদের জানিয়েছেন যে এনফিল্ড রাইফেলে পাঁঠার চর্বি দেবার জন্যে সরবরাহকারীকে বলা হয়েছিল, কিন্তু সে বেশি লাভের আশায় গরু-শুওরের চর্বি দিয়েছিল যেহেতু সেগুলোর দাম কম ছিল (অনিরুদ্ধ ৩৪)। ব্যবসায়ীদের চরিত্র প্রায় সর্বদা একই।

বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায়েরও আপত্তি ছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায় নিচু জাতের হিন্দুদের যে খুব বেশি সমাদর করতেন তা ভাবার কোনও কারণ নেই। দলিতদের সমস্যা নিয়ে হিন্দু ভদ্রলোক-পরিচালিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে খুব বেশি মাতামাতি হতো তাও নয়। ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত 'অস্পৃশ্যতা'-র মতো ভয়াবহ পাপাচার নিয়ে কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের কোনও মাথাব্যথা ছিল না, আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারাও সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির 'অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন'। ফলে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন শুরু হলো, তখন তথাকথিত নিচু জাতের হিন্দুরা সেই আন্দোলন থেকে দূরেই সরে থাকতে চেয়েছিলেন—যেমন *ঘরে বাইরে*-র পঞ্চু (শেখর ১৬৬-১৬৭)। এই সমস্যার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন। ১৯১৫ সালে হিতসাধনমণ্ডলীর এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন:

শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারি নে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উল্টো। গ্রামের চাষীরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। (রবীন্দ্রনাথ *পল্লীপ্রকৃতি* ৭৬৪)

'সদুপায়' শীর্ষক প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ কোনও রাখডাক না করেই লিখেছেন:

কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, [বয়কটজনিত] ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না। (রবীন্দ্রনাথ *সমূহ* ২৮৪)

বয়কট আন্দোলন সফল না হওয়ার পেছনে আরও একটি বড়ো কারণ ছিল—মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বড়ো অংশ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। যশবন্ত সিং যেমন বলেছেন, পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে বঙ্গচ্ছেদের ফলে তাদের সুযোগ-সুবিধে বাড়বে, আর তাই তাঁরা হিন্দু-নেতৃত্বাধীন বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে সম্মত ছিলেন না (যশবন্ত ৪৫)। তবে এ জন্যে কি মুসলমান সম্প্রদায়কেই সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া চলে? এমন কথা বলা যায় কি যে তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থের জন্যেই বঙ্গভাষী অঞ্চলের ব্যবচ্ছেদ সমর্থন করেছিলেন? দেখা যাক।

প্রথমেই মেনে নেওয়া যাক, কার্জন-কৃত বঙ্গচ্ছেদ বঙ্গভাষী অঞ্চলের মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। শুধু বাঙালিদের ঐক্য নষ্ট করা নয়, অবিভক্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বাঙালিদের ভাতে মারাও এর লক্ষ্য ছিল। কাজেই, কোনও পরিস্থিতিতেই এই বিভাজন মেনে নেওয়া সমুচিত ছিল না। তবু মুসলমান জনগোষ্ঠীর এক বড়ো অংশ কেন এই বঙ্গচ্ছেদকে সমর্থন করেছিলেন? সে কি শুধু নিজেদের স্বার্থই ভেবে? এ বিষয়ে আরও কিছু বলার আগে একটা বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট করা উচিত, যা যশবন্ত সিং বলেন নি। তিনি সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে অবিভক্ত বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বড়ো অংশ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বয়কট আন্দোলনে যোগ দেন নি বরং সে আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তিনি এ কথা বলেন নি যে গোড়ার দিকে অনেক মুসলমান নেতাই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন। নবাব

সলিমুল্লাহ্ খ্বাজা আতিকুল্লাহ্, আবদুর রসুল, আবদুল হালিম গজনবি বা হোসেন শিরাজির মতো গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান ব্যক্তিবর্গ শুধু যে এই বিভাজনের বিরোধিতা করেছিলেন তাই নয়, এর ফলে যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়াতে পারে সেই আশঙ্কাও করেছিলেন (শাশ্বতী ও অন্যান্য ১৮৫)। ফলে, সে দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সত্যিকারের মতানৈক্য ছিল না। কিন্তু, বিরোধ দেখা দিল তখন, যখন হিন্দু বাঙালিরা নিজেদের স্বার্থ সর্বাগ্রে বিচার করে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে নিজেদের সুবিধে মতো পরিচালনা করতে চাইলেন।

সুমন্ত ব্যানার্জি আমাদের জানিয়েছেন, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের ফলে সবচেয়ে বড়ো দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন হিন্দু ভূম্যধিকারী এবং মধ্যশ্রেণির হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা। তাঁরা বুঝেছিলেন, নবগঠিত প্রদেশে বঙ্গভাষীদের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন আর তাই যে কোনও মূল্যে তাঁরা এই বিভাজন রুখতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। অবিভক্ত বাংলাদেশে জমিদাররা প্রধানত ছিলেন হিন্দু 'অ্যাবসেন্টি ল্যান্ডলর্ড'—তাঁরা থাকতেন কলকাতায়, আর তাঁদের হয়ে জমিদারির দেখাশোনা করতেন নায়েব বা গোমস্তারা, যাঁরা অনেকেই গরিব প্রজাদের ওপর, যারা অনেকেই মুসলমান ছিলেন, মহাজন সেজে জুলুম করতেন। বস্তুত, অ্যাবসেন্টি ল্যান্ডলর্ডদের জমানায় পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে খুব খারাপ ছিল তা বোঝা যায় ১৯১১ সালের সেনসাস রিপোর্ট থেকে। সেই রিপোর্টে অখণ্ড বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগে নগরায়নের যে চিত্র দেওয়া হয় তা এরকম:

বিভাগ	গ্রামের সংখ্যা	শহরের সংখ্যা
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	২৭৮	৪৮
বর্ধমান বিভাগ	৮৬১	২৮
রাজশাহী বিভাগ	১৯৫৪	২০
ঢাকা বিভাগ	১৮৬৯	১৭
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৯০৪	৬

(অশোক ৯৬)

বলা বাহুল্য, ওপরের সারণি থেকে পরিষ্কার নগরায়ন-প্রক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গের তিনটি বিভাগ অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই খারাপ ছিল।

এদিকে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর হিন্দু জমিদার-নায়েব-গোমস্তা সবাই মিলে ভাবতে শুরু করে দিলেন যে সত্যি যদি নতুন প্রদেশ হয় যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি হয়ে উঠবে তাহলে তাঁদের প্রভাব আর প্রাধান্য খর্বিত হবে (সুমন্ত ব্যানার্জি ১৪৬-১৪৭)।

এই আশঙ্কা থেকে তাঁরা বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে মদত দিতে শুরু করেন, যে খেলা মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট হতে দেরি হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা বুঝতে পেরেছিলেন। *ঘরে বাইরে* উপন্যাসের শেষাংশ মুনসিয়ানার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন সুমন্ত ব্যানার্জি, দেখিয়েছেন উপন্যাসের শেষে বিদ্রোহী মুসলমান প্রজারা যখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বয়কট আন্দোলনের সমর্থক জমিদার হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ করছে আর তাঁর বাড়ির মহিলাদের ওপর অত্যাচার করছে তখন আসলে তারা অত্যাচারী হিন্দু জমিদার আর স্বদেশি আন্দোলনকারীদের আঁতাতের বিরুদ্ধে তাদের অবরুদ্ধ ক্ষোভের প্রকাশ করছে। তারা দেখেছিল হিন্দু জমিদাররা কীভাবে তাদের আর্থিক শোষণ আর সামাজিক বঞ্চনার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, আর তাই তাঁদের সঙ্গে স্বদেশিদের আঁতাত তারা সহ্য করতে পারে নি (সুমন্ত ব্যানার্জি ১৫১-১৫২)। এ কারণেই উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি স্বদেশি নেতা সন্দীপ বলে, 'মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্তানে পুঁতে রাখবার মতলব করেছে' (রবীন্দ্রনাথ *ঘরে বাইরে* ১২৬)। নিজের কৃতকর্মের ফল অবশেষে সে নিজেও অনুভব করছে।

এ কথা ঠিক, ইংরেজ শাসক তাদের নিজেদের স্বার্থে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উসকে দিয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল এমন কথাই বলেছেন—তিনি জানিয়েছেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে নামমাত্র সুদে এক লক্ষ পাউন্ড ঋণ দিয়ে তাঁর মাধ্যমে কার্জন বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে জাগিয়ে তুলেছিলেন (প্রশান্তকুমার পঞ্চম খণ্ড ১৭৩)। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার এক বছরের মাথায়—১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর—সারা ভারত থেকে পঁয়ত্রিশজন মুসলমানের এক প্রতিনিধিদল বর্তমান হিমাচল প্রদেশের শিমলা শহরে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করেন, ভারতের ইতিহাসে যা 'শিমলা ডেপুটেশন' হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেই প্রতিনিধিদলের মূল দাবি ছিল দেশীয় নির্বাচনে মুসলমানদের জন্যে 'ন্যায্য ভাগ' থাকতে হবে (যশবন্ত ৪৮)। স্বভাবতই, স্বদেশি আন্দোলন যখন তুঙ্গে, ব্রিটিশ সরকার তখন এই শিমলা ডেপুটেশনকে অস্ত্র করে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের বীজ বুনতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুত, সেই ১ অক্টোবর ১৯০৬ তারিখেই লেডি মিন্টো এক ব্রিটিশ অফিসারের কাছ থেকে একটি চিঠি পান, সে চিঠির একাংশ এইরকম:

> I must send Your Excellency a line to say that a very big thing has happened today, a work of statesmanship that will affect India and Indian history for many a long year. It is nothing less than the pulling back of 62 millions of people from joining the ranks of the seditious opposition. (যশবন্ত ৫১)

কোনও সন্দেহ নেই, শিমলা ডেপুটেশনকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতে হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যকে উসকে দিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য অটুট রাখতে চেয়েছিল, যাতে ৬ কোটি ২০ লক্ষ মুসলমান প্রজা সরকার-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে যোগ না দেন। কিন্তু ইংরেজদের পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব হয়েছিল এই কারণেই যে বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান-বিদ্বেষ আগে থেকেই ছিল—ব্রিটিশরা শুধু সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল। নীরদচন্দ্র এমনটাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন ব্রিটিশ শাসক হিন্দু-মুসলিম বিরোধ কাজে লাগাতে পেরেছিল কারণ হিন্দুদের মধ্যে আগে থেকেই মুসলমানদের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল (নীরদ সি. ২৬৭-২৬৮)। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এমন কথাই বলে গেছেন। হিন্দুরা যে মুসলমানদের কখনওই আপন করে নেয় নি সে কথা বোঝাতে 'ব্যাধি ও প্রতিকার'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। (রবীন্দ্রনাথ *পরিশিষ্ট* ৩৫২)

'সদুপায়' প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার করেই লিখেছেন:

> ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের প্রকৃত হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। (রবীন্দ্রনাথ *সমূহ* ২৮৪)

আর, ইংরেজদের হাতে যে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের অস্ত্র দেশের মানুষেরাই তুলে দিয়েছে, সে কথা ব্যাখ্যা করে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে বলেন:

> শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্‌কার দিতে হইবে। (রবীন্দ্রনাথ *পরিশিষ্ট* ৩৫১-৩৫২)

রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা যদি একটু মন দিয়ে পড়া যায়—ইংরিজিতে যাকে বলে 'রিডিং বিটুইন দি লাইন্‌স্'—তাহলে বোঝা যায় এখানেও তিনি আদতে ওই আত্মশক্তি জাগানোর কথাই বলছেন, বলছেন নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে ঐক্য স্থাপন করে

শত্রুর মোকাবিলা করা। কিন্তু তা করতে গেলে আগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা ছিল, যেমনটা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায়। কিন্তু রাজনীতির কারবারিরা তা না করে তড়িঘড়ি রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে ফেললেন—যার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো মুসলমানদের সঙ্গে না পাওয়া, কারণ হিন্দুদের এক বড়ো অংশ কখনওই মুসলমানদের আপন বলে গ্রহণ করে নি, আর তাই তাদের আস্থাও অর্জন করতে পারে নি। এমনকী, বয়কট আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দুরাও যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্লজ্জ মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় দিতেন তা জানা যায় রবীন্দ্রনাথের 'লোকহিত' প্রবন্ধ থেকে:

> হিন্দুমুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। (রবীন্দ্রনাথ *কালান্তর* ৫৯৯)

রাজনীতিতে নিজেদের প্রয়োজনে মুসলমানদের ব্যবহার করতে চাইব, অথচ তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দেব না—হিন্দু স্বাজাত্যবোধের এই দ্বিচারিতা আর অহংকারকে রবীন্দ্রনাথ এমন করেই বেআব্রু করে দিয়েছেন। আর সে কারণেই মুসলমানেরা মন থেকে স্বদেশি বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন নি—'সদুপায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেমন জানিয়েছেন, কোনও কোনও অঞ্চলে মুসলমানরা সস্তা করকচ লবণের পরিবর্তে 'অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবণ খাইতেছে' (রবীন্দ্রনাথ *সমূহ* ২৮২)।

হিন্দু বয়কট আন্দোলনকারীদের এক বড়ো অংশ আবার স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে কালী-প্রতিমার আরাধনা, গো-হত্যা নিবারণ ইত্যাদি হিন্দুত্বপন্থী কর্মসূচি ঢুকিয়ে এক ধরনের হিন্দু পুনরুত্থান ঘটাতে চেয়ে স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের আরও বিমুখ করে তুলেছিলেন (সুমন্ত ব্যানার্জি ১৫২)। এইভাবে হিন্দু পুনরুত্থানমুখী কর্মসূচি নেওয়া যে নির্বোধের মতো কাজ হয়েছিল সে কথা স্বীকার করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, তিনি বলেছিলেন:

> It gradually awoke, at least in a section of the nationalists, the foolish and suicidal ambition of once more re-establishing either a single Hindu state or a confederacy of Hindu states in India. (নীরদ সি. ২৭১)

বিশেষ করে গোহত্যা নিবারণ কর্মসূচি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের মত হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের পক্ষে একেবারেই ছিল না। 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার করেই বলেছেন যে তাঁর জমিদারির প্রজারা যখন কোরবানি রহিত করবার জন্যে তাঁর কাছে নালিশ জানাতে এসেছিল তখন সে নালিশ তিনি সঙ্গত বলে মনে করেন নি

(রবীন্দ্রনাথ *কালান্তর* ৭২৩)। আর এই গোহত্যা নিবারণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এক তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য স্মরণীয়:

> স্বাধীনতা স্বদেশ আত্মসম্মান মনুষ্যত্ব প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠতর পদার্থের অপেক্ষা গোরুকে রক্ষা করা যে আমাদের পরমতর কর্তব্য, এ কথা হিন্দু ভূপতি হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই সহজে বুঝিবে। (রবীন্দ্রনাথ *পরিশিষ্ট* ২৯৩)

বুঝতে অসুবিধে নেই, স্বদেশি আন্দোলনে একদিকে সন্ত্রাসবাদের অনুপ্রবেশ আর অন্যদিকে হিন্দুত্ব স্বাজাত্যবোধের রমরমা—এই দুই বিপদ দেখে রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন।

কিন্তু সরে এসেও কি রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন? তিনি যেভাবে স্বদেশি বিপ্লবের সমালোচনা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। নীরদচন্দ্রকে উদ্ধৃত করে কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসন আমাদের জানিয়েছেন, 'Tagore challenged all political, social, cultural and religious superstitions, and was therefore regarded as an apostate' (কৃষ্ণা ও অ্যান্ড্রু ১৪৯)। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন যে অরবিন্দ ঘোষ যখন কারান্তরালে তখন তাঁর কয়েকজন সহযোগী---শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ—রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতা করে *বন্দে মাতরম* পত্রিকায় ১৯০৯ সালের মে-জুন মাসে চারটি সংখ্যায় চারটি প্রবন্ধ লেখেন (প্রশান্তকুমার ষষ্ঠ খণ্ড ৭)। খুব স্বাভাবিকভাবেই, হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছিলেন তাঁর *ঘরে বাইরে* উপন্যাসের জন্যেও, কারণ এ উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশের বিপদ দেখিয়েছিলেন। *ঘরে বাইরে*-তে আমরা যেমন দেখি উন্মার্গগামী স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যে পত্র-পত্রিকায় নিখিলেশের নিন্দামন্দ প্রকাশিত হয়, ঠিক তেমনই স্বদেশি আন্দোলনের সমালোচনা করার জন্যে হিন্দুত্ববাদীরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাও করেন। *অর্চনা* পত্রিকার আষাঢ় ১৩২৩ সংখ্যায় লেখা হয়:

> রবীন্দ্রনাথ একজন স্বদেশী-প্রচারককে নায়ক করিয়া তাহারই মস্তকে পরস্ত্রীহরণ-প্রচেষ্টার আরোপ করিয়া আপন লেখনী মসীলিপ্ত করিলেন, এ দুঃখ প্রাণে বাজিল ... ... তিনি স্বদেশীর সর্ব্ব কার্য্যই দোষদুষ্ট বলিয়া বাহবা লইয়াছেন। (রবীন্দ্রনাথ ষোড়শ খণ্ড ৮৮৫)

শুধু তাই নয়, *নীলদর্পণ*-খ্যাত দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ওই *অর্চনা* পত্রিকারই ফাল্গুন ১৩২৬ সংখ্যায় *ঘরে বাইরে* উপন্যাসকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করে একটি ছড়া লেখেন:

> এ মহাপাতকে হিন্দু। তব পুণ্য গেহ
> করিও না কলঙ্কিত; আর্য্য রক্ত দেহ

ধর যদি এক বিন্দু একটি শিরায়,
যদি শুদ্ধ শুচিতার একটি রেখায়
শুদ্ধ থাকে ও চিত্তের এক তিল স্থান,
এ কলুষ হতে দূরে করো অবস্থান;
......
হায় বঙ্গ! যে কবির বীণায় আপনি
সুমন্দ মলয় এসে করে প্রতিধ্বনি।
তার কর প্রণালীর পূতিগন্ধময়
পঙ্কে কলঙ্কিছে যত দিব্য কুবলয়।

(রবীন্দ্রনাথ ষোড়শ খণ্ড ৮৮৬)

এমনকী, খুবই মজার ব্যাপার এই যে ১৯০৯ সালে—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসার প্রায় তিন বছর পর—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* নাটককে আক্রমণ করে বসলেন এই যুক্তিতে যে এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ একজন 'হিন্দুকুলবধূ'-র 'দুর্গতি' দেখিয়েছেন। *সাহিত্য* পত্রিকার বিংশতি বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন:

> আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারী, মা আমার! বঙ্গের কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমার যে এহেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি স্বপ্নেও ভাবো নাই। একজন যে-সে হিন্দুকুলবধূ যে অবস্থায় প্রাণ দিত, কিন্তু ধর্ম দিত না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া গ্রহণ করিলে! (দেবনাথ ৫৩)

রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এ নাটক প্রকাশিত হবার দীর্ঘ সতেরো বছর পর হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের মনে হলো নাটকটি মন্দ, কারণ এতে 'হিন্দুকুলবধূ'-র 'দুর্গতি'-র কথা বলা হয়েছে। বোঝাই যায়, স্বদেশি-পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতেই দ্বিজেন্দ্রলালের এই আকস্মিক 'বোধোদয়'।

চতুর্থ অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু স্বাদেশিকতা—অন্ত্য পর্ব

> আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতে হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতে হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত ইচ্ছা ও আচরণ-বৈচিত্র্যের অপঘাতমৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্বলাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি।

মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতি কুৎসিতভাবে গালি দিতেছি; এমন-কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। (রবীন্দ্রনাথ *রাজা প্রজা* ২৪১)

'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে এমনভাবেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের নেতাদের সমালোচনা করেন। লক্ষণীয়, তিনি শুধু এখানে এ কথাই বলছেন না যে স্বদেশি নেতারা জোর করে, ভয় দেখিয়ে, বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'শারীরিক আঘাতের দ্বারাও' অনিচ্ছুককেও আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য করছে—রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা এখানে আরও ব্যাপক, আরও গভীর, কারণ এর মধ্যে দিয়ে তিনি জাতির জীবনে স্বদেশি আন্দোলনের এক ভয়াবহ ক্ষতিকারক দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তিনি যখন বলেন 'আচরণ-বৈচিত্র্যের অপঘাতমৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্বলাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি', তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বদেশি নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি এই অভিযোগ আনছেন যে তাঁরা আমাদের দেশ ভারতবর্ষের এক সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' নষ্ট করে দিতে বসেছেন। 'নানা জাতি নানা মত নানা পরিধান'-এর এই দেশে যে ভিন্ন রাজনৈতিক বা সামাজিক মতামতকেও সম্মান জানানো উচিত সে কথা স্বদেশি নেতারা ভুলতে বসেছিলেন, আর তাই *ঘরে বাইরে*-র সন্দীপের মতো তাঁরা ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে চেয়েছিলেন, যা শুধু যে তাঁদের আন্দোলনের পক্ষে আত্মঘাতী হয়েছে তাই নয়, আমাদের দেশের বহুত্ববাদ বা 'pluralism'-র পক্ষেও ক্ষতিকর হয়েছে। এই সমালোচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মূলত স্বদেশি আন্দোলনের হিন্দু-জাতীয়তাবাদী চরিত্রেরই সমালোচনা করেছেন তা বুঝতেও আমাদের দেরি হয় না, নচেৎ তিনি এমন কথা বলতেন না যে এ আন্দোলন দেশের 'আচরণ-বৈচিত্র্যের অপঘাতমৃত্যু' ঘটাচ্ছে।

আরও এক গুরুত্বপূর্ণ কারণে রবীন্দ্রনাথের এ সমালোচনা বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর *ন্যাশনালিজম্* বক্তৃতামালায় বলেছেন যে দেশপ্রেম আসলে হলো দানবীয় লোভের পূজার উপাচার (রবীন্দ্রনাথ *ন্যাশনালিজম্* ৯), আর জাতীয়তাবাদ এক মারাত্মক দুষ্ট ব্যাধি (রবীন্দ্রনাথ *ন্যাশনালিজম্* ৭৪)। তাঁর সেই মতামতের ছায়াই যেন আমরা দেখি 'পথ ও পাথেয়'-তে। আমরা জানি, উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেই ফ্যাসিবাদের জন্ম, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়—রবীন্দ্রনাথ যখন 'পথ ও পাথেয়' লিখেছিলেন—পৃথিবীর মানুষের ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না, অথচ এখানে রবীন্দ্রনাথ যেন এমন কথাই বলছেন যে স্বদেশি আন্দোলনে ফ্যাসিবাদী চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। স্মরণ করা যেতে পারে, নীরদ চৌধুরীও তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন এই দুটি কথা—প্রথমত, স্বদেশি আন্দোলন পর্যবসিত হয়ে

গেছিল হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনে (নীরদ সি. ২৬৪), এবং দ্বিতীয়ত, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে নাৎসিবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় (নীরদ সি. ২৬২)। এ যেন হুবহু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেরই প্রতিফলন।

স্বদেশি আন্দোলনের এ হেন কঠোর সমালোচনা করার জন্যে রবীন্দ্রনাথের ওপর ঠিক তেমনই কুৎসিত গালি আর শারীরিক আঘাত নেমে এসেছিল যেমন তিনি বলেছিলেন 'পথ ও পাথেয়'-তে, এবং অন্তত দুটি ক্ষেত্রে তথাকথিত হিন্দু-জাতীয়তাবাদীরা যুক্ত ছিলেন। তবে, তার আগে এক মজার ব্যাপারের প্রতি আমাদের নজর ঘোরাতে হয়। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের বেশ কিছুদিন পরে লর্ড কার্জন তাঁর ব্যক্তিগত চিঠি ও টেলিগ্রামের তালিকা প্রকাশ করেন। তখন দেখা যায়, ১৯০৫-এর আগস্ট মাসে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় হিসেবে পদত্যাগ করার পরে অনেক 'রাজভক্ত' ভারতীয়ই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানজ্ঞাপন করে তাঁকে চিঠি বা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন, আর সবচেয়ে মজার ঘটনা হলো এই যে সেই তালিকাতে একটি নাম ছিল জনৈক 'আর. টেগোর'-এর—তিনি না কি কার্জনকে ভারতের 'শ্রেষ্ঠ শাসক'-রূপে অভিহিত করেছিলেন (কৃষ্ণা ও অ্যান্ড্রু ১৪৪)। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে স্বদেশি আন্দোলনের সমালোচনা করার জন্যে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-হননে তৎপর কোনও ব্যক্তি বা মহল এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকবেন। তবে, এর চেয়েও মজার ব্যাপার ঘটেছিল, আর ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ওপর বিক্ষুব্ধ মহলই—যাঁদের মধ্যে হিন্দুত্বপন্থী লোকজন ছিলেন বা এখনও আছেন। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লিতে ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের দরবার-অভিষেকের পর এক শ্রেণির মানুষ বলতে শুরু করেন যে ভারতের বর্তমান জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' না কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন পঞ্চম জর্জের প্রশস্তিগাথা হিসেবে। এখনও যে এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে নি তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের দুই ইংরেজি জীবনীকার কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসনও বলেছেন 'খুব সম্ভবত' পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষেই এই গান লেখা হয়েছিল (কৃষ্ণা ও অ্যান্ড্রু ১৬১)। তাঁরা এটা ভেবে দেখেন নি, যে রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ-কৃত গণহত্যার বিরুদ্ধে এককভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে নাইটহুড ফিরিয়ে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, বা যে রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও এলিনর র‍্যাথবোন বা ফস ওয়েস্টকোটকে ব্রিটিশ কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, বা—সবচেয়ে বড়ো কথা—যে রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধির সন্দর্ভ থেকে পূর্ববর্তী ভারতীয় অক্সফোর্ড-ডক্টরেট শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সব উল্লেখ বাদ দিতে চেয়েছিলেন কারণ শৌরীন্দ্রমোহন ব্রিটিশ মহারানি ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে এমন এক প্রশস্তিকাব্য রচনা করেছিলেন যা খোদ

ব্রিটিশদেরও অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল (কৃষ্ণা ও অ্যান্ড্রু ২০), সেই রবীন্দ্রনাথ কখনওই ব্রিটিশ সম্রাটের প্রশস্তিতে কোনও গান রচনা করতে পারেন না। মজার ব্যাপার, খোদ ইংরেজরাই এমন গুজব বিশ্বাস করেন নি। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল আমাদের জানিয়েছেন যে ইংরেজ কবি ইয়েট্‌স্‌-কে যখন এক লন্ডন-বাসী বাঙালি দুঃখ করে বলেছিলেন যে বাংলাদেশে কোনও দেশপ্রেম নেই কারণ তাদের শ্রেষ্ঠ কবি ব্রিটিশ সম্রাটের প্রশস্তি করে কবিতা লিখেছেন, তখন ইয়েট্‌স্‌ সে কথা বিশ্বাস না করে রবীন্দ্রনাথের এক ছাত্রের কাছে আসল তথ্য জানতে চেয়েছিলেন, আর ইয়েট্‌সের কাছ থেকে সে তথ্য জানার পর আমেরিকান কবি এজরা পাউন্ড তাঁর বাবা হোমার এল. পাউন্ডকে এক চিঠিতে গোটা ঘটনাটিকে 'ভোলতেয়ারোচিত রসিকতা' বলে বর্ণনা করেছিলেন (প্রশান্তকুমার ষষ্ঠ খণ্ড ২৫৭)। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। ১৯৩৭ সালের ২০ নভেম্বর পুলিনবিহারী সেনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন:

> রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথী, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেন না তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক বুদ্ধির অভাব ছিল না। (প্রশান্তকুমার ষষ্ঠ খণ্ড ২৫৬)

এ কথাও স্মরণযোগ্য যে ১৯১১-র ২৭ ডিসেম্বর কংগ্রেসের সভায় যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত জনগণমন গানটি দেশাত্মবোধক গান হিসেবেই গাওয়া হয়েছিল, রাজ-প্রশস্তি হিসেবে নয়, সে কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিল *বেঙ্গলি* পত্রিকা, কিন্তু ইংরেজ-সম্পাদিত *দি ইংলিশম্যান* বা *দি স্টেট্‌স্‌ম্যান* বিকৃত খবর পরিবেশন করেছিল যে এ গান সম্রাটের জয়গান হিসেবে গাওয়া হয়েছিল (সেমন্তী)। কিন্তু হায়, তবু রবীন্দ্রনাথের দুর্নাম ঘোচে নি, এখনও হিন্দু-জাতীয়তাবাদীদের একাংশ তাঁকে এই বলে দোষারোপ করে যে তিনি জনগণমন লিখেছিলেন ব্রিটিশ সম্রাটের প্রশস্তি হিসেবেই। 'হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি'-র ওয়েবসাইটে ২৭ ডিসেম্বর ২০১১ সালে ব্রহ্মশ্রী ড. পি. ভি. বর্তক নামে এক লেখক পরিষ্কার জানিয়েছেন যে এ গান রাজ-প্রশস্তিই, কারণ তখন ভারতের 'অধিনায়ক' ছিলেন ব্রিটিশ সম্রাটই। রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক দোষ

খুঁজে পেয়েছেন এই লেখক—জানিয়েছেন যে এ গানে 'গাহে তব জয়গাথা' বলতে পঞ্চম জর্জের জয়গাথাই বোঝানো হয়েছে; এমনকী রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ-প্রীতি' বোঝাতে তিনি এও অভিযোগ করেছেন যে 'ইংরেজ-প্রীতি'-র কারণেই না কি তিনি নিজের নামের পদবি 'ঠাকুর' থেকে 'টেগোর' করেছিলেন। হায়, এ ব্যক্তি বোধ করি জানতেন না যে রবীন্দ্রনাথের বহু আগে থেকেই তাঁর পরিবারের পদবি ভারতে-আসা ইংরেজদের উচ্চারণে 'টেগোর' হয়ে গেছিল—তাঁর ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথের নাম ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স উচ্চারণ করেছিলেন **'Dwarkanaught Tagore'** হিসেবে (কৃষ্ণা ও অ্যান্ড্রু ২৪)। তবে, জনগণমন-গানের বিরুদ্ধে ব্রহ্মশ্রী ড. পি. ভি. বর্তক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিযোগ করেছেন এই যে এ গানে 'পাকিস্তানের অংশ' সিন্ধু প্রদেশের নাম আছে (**http://www.hindujagruti.org/news/13248.html**)। সত্যি বটে রবীন্দ্রনাথের বোঝা উচিত ছিল তাঁর মৃত্যুর পর ভারতের মানচিত্র পালটে যাবে! এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মন্তব্য করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। জনগণমন-গানে 'স্নেহময়ী তুমি মাতা'-র উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন ব্রিটিশ সম্রাট যদি এ গান তাঁর উদ্দেশে রচিত তা জেনে এই পঙ্ক্তি শুনতেন তবে নির্ঘাৎ বলতেন:

> আমি এখ্খুনি ফিরে যাচ্ছি দেশে। সব সইতে পারি। কিন্তু আমি মা, আমি স্ত্রীলোক! বুঝেছি লোকটার ইনসলেন্স। বলতে চায়, কূটনৈতিক কারণে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য—**raison d'etat**—আমি মাগী হওয়া সত্ত্বেও মেকডনাল্ড বলডুইন আমাকে মদ্দার বেশে সাজিয়েছে। আমি আসলে মেনি, ওরা পরিয়েছে হুলোর ছদ্মবেশ। (সৈয়দ মুজতবা ১৫৮)

তবু, হিন্দুত্বপন্থীদের একাংশের কাছে রবীন্দ্রনাথের দুর্নাম ঘোচে না, কারণ স্বদেশি আন্দোলনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে তিনি তাঁদের বিরাগভাজন হয়েছেন।

তবে, এই সব নয়। রবীন্দ্রনাথের ওপর শারীরিক আক্রমণের পরিকল্পনা—এমনকী হত্যা চক্রান্তের পরিকল্পনা পর্যন্ত—করা হয়েছিল। ১৯১৬ সালে জাপান ও আমেরিকা সফরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেন। সে যুগে এই দু-দেশের জাতীয়তাবাদী মানুষজন কবির এ-হেন সমালোচনা ভালোভাবে গ্রহণ করেন নি। জাপান তখন উদগ্র জাতীয়তাবাদে উন্মত্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সায় আক্রান্ত, তাই অধিকাংশ জাপানবাসীই রবীন্দ্রনাথের কথা পছন্দ করেন নি (প্রশান্তকুমার সপ্তম খণ্ড ১৯০)। আমেরিকার *ডেট্রয়েট জার্নাল*-এও লেখা হয় কবি-কৃত জাতীয়তাবাদের সমালোচনা হলো আসলে এক ধরনের মানসিক বিষ (কৃষ্ণ ১৫২)। একইভাবে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদেরও কিয়দংশ তখন মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তা দেশের

স্বাধীনতা-আন্দোলনের পক্ষে বিপজ্জনক। মার্কিন-প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্যাসিফিক কোস্ট হিন্দুস্থানি অ্যাসোসিয়েশন (পরবর্তীকালে যা গদর পার্টি বলে পরিচিত হয়) চিরকালই জাপানকে বন্ধুস্থানীয় দেশ বলে ভেবে এসেছিল, আর তাই 'রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানের জাতীয়তাবাদকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন, তখন তা এই দলের সদস্যদের পছন্দ হয়নি'। গদর পার্টির নেতা রামচন্দ্র ১৯১৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সানফ্রানসিস্কোর *Call* পত্রিকায় একটি চিঠি লিখে অভিযোগ করেন রবীন্দ্রনাথের আসল উদ্দেশ্য হলো ব্রিটিশ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপক্ষে প্রচার করা। সেই একই বছরের ৫ অক্টোবর আমেরিকার *Examiner* পত্রিকায় প্রকাশিত আরও এক চিঠিতে ব্রিটিশ শাসনে হিন্দুদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে রামচন্দ্র লেখেন ব্রিটিশ-কর্তৃক নাইটহুড উপাধি পাওয়ার পরেই রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশদের প্রশংসা ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সমালোচনা করছেন। এমনকী, তাঁর বিশিষ্ট দুই ব্রিটিশ বন্ধু সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ ও উইলিয়াম পিয়ারসন আদতে ব্রিটিশ 'এজেন্ট' আর তাঁদের দ্বারা চালিত হয়েই কবি এ হেন অপকর্ম করছেন—এমন হাস্যকর আর অশ্রদ্ধেয় উক্তিও রামচন্দ্র করেন (প্রশান্তকুমার সপ্তম খণ্ড ২০৭)।ওই একই পত্রিকায় গোবিন্দ্ বিহারী লাল আরও লেখেন যে হিন্দুরা মনে করে না রবীন্দ্রনাথ তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা দার্শনিক মতামতের প্রতিনিধিত্ব করেন। হিন্দুরা যে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনকে আদৌ আমল দেন না এমন কথাও সে চিঠিতে তিনি লেখেন (প্রশান্তকুমার সপ্তম খণ্ড ২০৮)। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু-বিরোধী'—এই প্রচার এমন মাত্রা ধারণ করেছিল যে দুই ভারতীয়, যাদের নাম ছিল জীবন সিং ও এইচ সিং হাতেশি, ১৯১৬-র ৫ অক্টোবর সানফ্রানসিস্কোর প্যালেস হোটেলে রবীন্দ্রনাথের ওপর হামলা করতে যায়। এই দুই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সম্ভাব্য হত্যাকারীই ছিল, এবং তাদের নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্যেই তারা পুলিশের হাতে বন্দি হয় (কৃষ্ণা ও অ্যান্ড্রু ২০৪)। এই প্রহসনের এখানেই শেষ হয় বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মতামত যে হিন্দু নেতাদের একাংশের খুব পছন্দ ছিল না তা এ থেকে প্রমাণিত হয়; আর রবীন্দ্রনাথের ওই দুই সম্ভাব্য হত্যাকারী যদি সরাসরি হিন্দুত্ববাদী নাও হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথ যে 'হিন্দু-বিরোধী'—এমন প্রচারই যে তাদের অযথা উত্তেজিত করেছিল তা নিয়েও কোনও সংশয় থাকে না। ইতিহাসের পরিহাস এমনই যে, যে রবীন্দ্রনাথকে ব্রিটিশ-অনুগত বলে বর্ণনা করেছিলেন রামচন্দ্র সেই রবীন্দ্রনাথই এ ঘটনার মাত্র তিন বছর পরে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ-কৃত নারকীয় গণহত্যার বিরুদ্ধে একক প্রতিবাদ করে ব্রিটিশ সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত নাইটহুড ফিরিয়ে দেন। অবশ্য, সে ঘটনা দেখার জন্যে রামচন্দ্র তখন আর বেঁচে ছিলেন না, তার প্রায় এক বছর আগেই তিনি নিজের দলের বিপ্লবীদের গুলিতেই প্রাণ হারান (প্রশান্তকুমার

সপ্তম খণ্ড ২০৮)। যাঁরা সমাজে বিদ্বেষ ও হিংসার আগুন জ্বালান তাঁরা বোধ হয় এমন করেই নিজেরাই সে বিদ্বেষের শিকার হয়ে ওঠেন, যেমন দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর *চার অধ্যায়* উপন্যাসে। আর, ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ-বিরোধী মতামতের জন্যে তাঁর ওপরে ঘটে যাওয়া হত্যা-প্রচেষ্টার তিন দশকের মধ্যেই পৃথিবী দেখে উগ্র জাতীয়তাবাদের বীভৎস চেহারা, ফ্যাসিবাদ আর নাৎসিবাদের রূপ নিয়ে যা পৃথিবীর মানুষের কাছে এক দুর্যোগপূর্ণ সময় নিয়ে এসেছিল—তখন মানুষ বুঝেছিল জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে সঠিক সতর্কবার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পর ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস বিচিত্র মোড় নিতে শুরু করে। ১৯১৬ সালে যে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ লখনউতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তির পৌরোহিত্য করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পটভূমিকা গঠন করেন, সেই জিন্নাহ্ই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মধ্যরাতে লাহোরে 'পাকিস্তান রেজলিউশন' প্রস্তুত করে ভারত-বিভাগের পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করেন (যশবন্ত ২৭২)। যে মুসলিম লিগ ১৯৩৭-এর নির্বাচনে সারা ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার মাত্র ৪.৮ শতাংশ ভোট পেতে সক্ষম হয় (যশবন্ত ২০৯), মাত্র দশ বছরের মধ্যেই সেই মুসলিম লিগই পাকিস্তান তৈরি করতে সমর্থ হয়। অবশ্য, তার মাঝে গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে—১৯২৯-এর ২৩ ডিসেম্বর প্রাক্-গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধি এবং মোতিলাল নেহরুর আচরণ দেখে তেজ বাহাদুর সপ্রু, মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ আর বিঠলভাই প্যাটেলের বিস্ময়-প্রকাশ (যশবন্ত ১৭৫), ১৯৩৭-এর ১২ মে আনন্দ ভবনে বসে জওহরলাল নেহরু-র হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে নস্যাৎ করে দেবার প্রয়াস (যশবন্ত ২১৭), এবং সর্বোপরি ১৯৪৬-এ ক্যাবিনেট মিশন-কর্তৃক জিন্নাহ্-র সব পরিকল্পনাতে জল ঢেলে দেওয়া, যা দেখে স্বয়ং গান্ধি পর্যন্ত মন্তব্য করেছিলেন যে জিন্নাহ্-র মতো এক মহান ভারতীয়র সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশনের এমন আচরণ ঠিক হয় নি (যশবন্ত ৩৮৬)—এ সব ঘটনাই ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায়। এমন সব কালিমালিপ্ত ঘটনা-সমাহারের চরম পরিণতি ঘটেছিল ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার সময়ে, যখন কলকাতা শহরের বীভৎস ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার খবর শুনে জওহরলাল নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীন অ-সমব্যথীর মতো মন্তব্য করেছিলেন, 'Our programme will certainly not be upset because a few persons misbehave in Calcutta' (যশবন্ত ৩৮৫)। ক্ষমতার আস্বাদের মোহ এমন করেই দেশের নেতাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—আর দেশের মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল নির্মম অন্ধকারের অনিশ্চয়তায়।

তবে, প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকানো থাকে, ঠিক তেমনই এই নির্মম অন্ধকারও একদিনে গড়ে ওঠে নি। ১৯৩১ সালে 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সংকীর্ণ, যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর' (রবীন্দ্রনাথ *কালান্তর* ৭২৩)। এমনভাবেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের সমস্যাকে বুঝেছিলেন, যে সমস্যাকে এই প্রবন্ধ প্রকাশের ছ-বছর পর নস্যাৎ করে দেবার প্রয়াস করেছিলেন জওহরলাল—যার ফলে সে সমস্যা আরও বহুল পরিমাণে ডালপালা ছড়াতে পেরেছিল। এ কথা ঠিক, যেমন আমরা আগে দেখেছি, প্রতিবারই ইংরেজ সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। তাদের কৌশল ছিল একেবারে সরল—চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে সজাগ থাকার পরামর্শ দেওয়া। এমন ভঙ্গিতেই ভারতের ব্রিটিশ রাজের কৌশলকে বর্ণনা করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রোসালিন্ড ও'আনলন:

> **In essence, their approach was to invite all parties to pursue the rights and wrongs of their cases ... ... Naturally, therefore, the leaders of each faction felt honour bound to take up the cause on each side, and disputes were dragged out and further embittered.** (যশবন্ত ১২১)

কিন্তু, এ ক্ষেত্রেও সেই পুরোনো কথাই স্মরণ করতে হয়—ভারতীয়দের নিজেদের বিভেদই ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল। 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধে 'হিন্দুর তরফ থেকেই' বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মুসলমানের ত্রুটিবিচারটা থাক্—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি' (রবীন্দ্রনাথ *কালান্তর* ৭২৩)। এ লজ্জা শুধু এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের জমিদারির সেরেস্তাতে জাজিমের ওপর বসতেন হিন্দুরা, আর মুসলমানদের বসার জন্যে জাজিম একধারে তোলা থাকত, বা এ জন্যেও নয় যে ঘরে মুসলমান ঢুকলে হুঁকোর জল ফেলে দেওয়া হতো—যা আমরা আগেই দেখেছি। এ লজ্জার গভীরতা আরও অনেক বেশি। কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেনকে উদ্ধৃত করে মুনতাসীর মামুন আমাদের জানিয়েছেন যে এক গরিব মুসলমান এক সম্পন্ন হিন্দুর বাড়ির উঠোনে চলে এলে সেই হিন্দু 'জাত গেল' বলে সেই মুসলমানকে 'জুতা পেটা করে'। তখন সেই গরিব মুসলমান কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'কর্তা, ওহান দিয়া তো আপানাগো কুকুরডাও যায়, ভাতের হাঁড়ি কি তাতে ফেলা যায়? মুই তো এট্টা মানুষ কর্তা' (মুনতাসীর ৫০-৫১)। এমন সব ঘটনা বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে যে কী গভীর সংকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তা বোঝা যায় *গোরা* উপন্যাসে, যখন পরেশবাবু সুচরিতাকে বলেন:

একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়, মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে আর কী বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনোই পৃথিবীতে বড়ো হতে পারে না ... ... (রবীন্দ্রনাথ *গোরা* ৭২৪)

ওপরের উদ্ধৃতির শেষ বাক্য যেন এক অমোঘ সতর্কবার্তার রূপ পেয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের দুর্ভাগ্য—এমন সতর্কবার্তা দেখেও হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের ত্রুটি সংশোধনের পথে না গিয়ে অপরের দোষ দেখতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা বোঝেন নি মানুষকে মানুষের প্রাপ্য সম্মান না দিলে অন্য পথে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এমন সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে—বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন-একটি পাপকে আমরা পোষণ করিতেছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না' (রবীন্দ্রনাথ *পরিশিষ্ট* ৩৫২)। অতীব লজ্জা ও দুঃখের কথা, ১৯০৭ সালে প্রকাশিত এ প্রবন্ধের সতর্কবার্তা হিন্দু সমাজকে সংযত করতে পারে নি, আর তাই তার দীর্ঘ আড়াই দশক পরেও ১৯৩২ সালের 'নবযুগ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেন, 'পশুর প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি মানুষকে যদি তার চেয়েও অধম স্থান দিই তবে সেই অধমতা কি আমাদের সমস্ত সমাজেরই বুকের ওপর চেপে বসবে না' (রবীন্দ্রনাথ *কালান্তর* ৭২৮)।

সেই 'অধমতা'-ই অবশেষে বাংলা তথা ভারতের বুকের ওপর চেপে বসল ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট, বিচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবে, যে পরিণাম হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বুঝেও না বোঝার ভান করেছিলেন, গুরুত্ব দেন নি রবীন্দ্রনাথের সতর্কবার্তাকে। ইতিহাসের আরও পরিহাস এই যে, যে বাঙালি হিন্দু সমাজ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে বিপুলভাবে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল, সেই সমাজই বিয়াল্লিশ বছর পরে আরও এক বঙ্গবিভাজনের প্রস্তাবকে যেন সাগ্রহেই মেনে নিল। এমন পরিণামের কথাও আশংকা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশ দেখে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন:

পরের কৃত বিভাগ লইয়া দেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মকৃত বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয়, ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড কার্জন-মূর্তি পরিহার করিয়া আত্মীয়মূর্তি ধরিয়াই দেখা দেয়, তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না। (রবীন্দ্রনাথ *সমূহ* ২৬৭)

শেষে কার্জন নয়, ১৯৪৭-এর বঙ্গ-বিভাজন তথা ভারত-বিভাজনের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল সেই আত্মীয়মূর্তিই—'আত্মকৃত বিভাগই' ভারতীয় উপমহাদেশের পরিণাম হয়ে দেখা দিল, যেমন ভয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ চার দশক আগে। আমরা আরও স্মরণ করতে পারি, নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হিন্দু বাঙালিদের সমালোচনা করেছিলেন এই ভাষায়: **'The Bengali Hindu has been as right in 1947 as he was in 1905'** (নীরদ সি. ২৫৯)—অর্থাৎ এই দুই ক্ষেত্রেই হিন্দু বাঙালিরা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে চাওয়া ছাড়া আর কিছুই ভাবে নি। পরবর্তীকালে জয়া চ্যাটার্জি নাম্নী এক গবেষক লেখেন:

> বাংলার হিন্দু ভদ্রলোকদের ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতা, ধন সম্পদ ও মর্যাদা হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় তারা সামাজিক অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে কূট-কৌশল অবলম্বন করে এবং নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা হিসেবে বিভিন্ন ভাবাদর্শকে ব্যবহার করে। (মুনতাসীর ৫২)

এ কারণেই ১৯০৫-এ বাঙালি হিন্দুদের বিভাজন-বিরোধী অবস্থান আর ১৯৪৭-এ তারা বিভাজন-পন্থী, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যেনতেনপ্রকারেণ নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখা—সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে তারা 'বিভিন্ন ভাবাদর্শকে ব্যবহার' করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। আমরা আরও স্মরণ করতে পারি, দেশভাগের ঠিক এক বছর আগে কলকাতায় যে মর্মান্তিক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ঘটেছিল তার একটা কারণ যদি হয় বাংলায় তৎকালীন মুসলিম লিগ সরকারের মদত (সন্দীপ ৮২), আরেকটি কারণ তবে অবশ্যই হিন্দু মধ্যবিত্তের ধারণা যে 'বাঙলায় তাদের আধিপত্য টলে যাচ্ছে' (সন্দীপ ১২৭)। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লিগের বিপুল জয় হিন্দুদের আতঙ্কে ফেলে দেয়—সম্ভবত এই জয়ের কথা অনুমান করেই ১৯৪৬-এর গোড়াতেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ডায়ারিতে লিখেছিলেন যে ভারতের কোনও প্রান্তে ইসলামের পতাকা উড়বে এটা মেনে নেওয়া যায় না (সন্দীপ ১২৮)। বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদের এই আত্মগর্বই অবশেষে বঙ্গ-বিভাজনের এক বড়ো কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাজা রামমোহনের সতীদাহ-বিলোপের আন্দোলনের বিরোধিতা থেকে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা তথা দেশ-বিভাজন—প্রায় সওয়া শতাব্দীর এই যাত্রাপথে বাংলাদেশের হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের ভূমিকা খুব উজ্জ্বল নয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হয়, যা আমাদের খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন অমর্ত্য সেন। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌কে মনে করা হয় ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিজাতি-তত্ত্বের উপস্থাপক, যা তিনি উপস্থাপনা করেছিলেন ১৯৪০-এ লাহোরে 'পাকিস্তান রেজোলিউশন'-এর

সময়ে। কিন্তু, সঙ্গতভাবেই অমর্ত্য সেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনের অনেক আগেই—১৯২৩ সালে—বিনায়ক দামোদর সাভারকার তাঁর *হিন্দুত্ব* শীর্ষক গ্রন্থে দ্বিজাতি-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন (অমর্ত্য ৫০)। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এ হেন বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব অনুমোদন করতেন না।

পরিশিষ্ট : রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানি' সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের ঠিক ছ-বছর আট দিনের মাথায় বাংলা তথা ভারতের বিভাজন ঘটে। তাঁর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, এ বিভাজন তিনি দেখে যেতে পারেন নি—কিন্তু বিভাজনের আঁচ তিনি নিশ্চিত পেয়েছিলেন। দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নারীহরণ, নারী-উৎপীড়ন—কোনও কিছুই তাঁর দেখে যেতে বাকি ছিল না। পরম পরিতাপের বিষয় হলো, জীবনের সিংহভাগ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আসা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক আঘাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পান নি। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী অবিভক্ত বাংলাদেশে মুসলিম লিগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর সাহিত্য পৌত্তলিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৩৯ সালের ১৭ মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেন যে তাঁর রচনা 'এখানে ওখানে মুসলমানি ছুরির খোঁচা খায়'। এমনভাবে পৌত্তলিকতার অভিযোগ তুলে সাহিত্যের সাম্প্রদায়িক বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সে চিঠিতে আরও লেখেন:

> সাহিত্যে রাষ্ট্রনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় না তা বলি নে, কিন্তু সে যদি ফৌজদারি মামলা চালাবার মোক্তারি করতে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় তাহলে দেশবিদেশের সাহিত্যে মড়ক লাগবে যে। তাহলে সাম্প্রদায়িক শাসনকর্তারা একদিন ইংরেজি সাহিত্যকেও আমাদের বিদ্যালয় থেকে নির্বাসন দেবেন—কেননা ঐ সাহিত্য খ্রীষ্টানের সাহিত্য হোলেও পৌত্তলিক দেবদেবীর নামে ও ভাবরসে সমাকীর্ণ, অভিষিক্ত। (রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের শ্রেণীবিচার' ৩৭৮)

বস্তুত, হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা ও সমালোচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ বারবার নিজেকে দেখেছেন কট্টর মুসলমানি সমালোচনায় বিদ্ধ হতে। মহম্মদ আকরম খান, যিনি স্বদেশি যুগে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধিতায় সোচ্চার ছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে তাঁর সম্পাদিত *মাসিক মোহম্মদী* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে 'হিন্দু কবি' ছাড়া আর কিছুই ভাবেন নি। 'গুপ্তধন' গল্পে তান্ত্রিকের পুজোর বর্ণনার উল্লেখ করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ শুধুই হিন্দু লেখক—এমনকী চরম আপত্তিকরভাবে 'পূজারিণী'-র দুই পঙ্‌ক্তি ('বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর/কিছু নাই ভবে পূজা করিবার') বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে তিনি এও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ আসলে তাঁর কাব্যে 'হিন্দু

পৌত্তলিকতা' প্রচার করতে চেয়েছেন। আকরম খান নিশ্চয়ই জানতেন যে এই পঙ্‌ক্তি-দুটি রবীন্দ্রনাথ বসিয়েছিলেন অজাতশত্রুর মুখে, যে অজাতশত্রুর অবাধ্যতা করেই শ্রীমতী নামের দাসী এ কবিতায় বুদ্ধের আরাধনা করেছিল। এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হয় না যে এ ক্ষেত্রে আকরম খান খানিকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই রবীন্দ্রনাথের অন্যায় সাম্প্রদায়িক সমালোচনা করেছিলেন। এমন অন্যায় সমালোচনার যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—*প্রবাসী* পত্রিকায় তিনি জানিয়েছিলেন বাংলাদেশে তাঁর সম্বন্ধে এমন কুৎসা প্রচার করা হতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেন না। কিন্তু তবু এমন কুৎসা তাঁর সম্বন্ধে বার বার রটেছে, রটিয়েছেন তাঁরা যাঁরা সাহিত্যের চেয়ে সাম্প্রদায়িকতাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। *মোহম্মদী* পত্রিকায় এক সময়ে এমন কথাও লেখা হয়েছিল যে ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথ রদ্দি মাল আহরণ করেছেন, আর তাঁর অনুকরণ করে মুসলমানরা তাঁদের নিজেদের সমাজকে ক্লেদাক্ত করে তুলছে। এমনকী, আকরম খান এমন কথাও লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ এক নিম্নমানের কবি—দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির মুসলমান কবির সমগোত্রীয় (শাহাদাত ৩৫৮-৩৫৯)। রবীন্দ্রনাথ যে অ-ইসলামীয়, এমন বার্তা এত সূক্ষ্ম চাতুর্যের সঙ্গে রটনা করা হয়েছিল যে ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন মহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে বিশ্বভারতীর ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তখন শহীদুল্লাহ্ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদিও লিখিতভাবে তিনি জানিয়েছিলেন তিনি এ কাজের যোগ্য নন, আসলে কিন্তু সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায়—শাহাদাত খান যেমন করেছেন—'বাঙালি হিন্দু' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শহীদুল্লাহ্ নব্য-গোঁড়া মুসলিম সমাজের বিরাগভাজন হতে চান নি। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ যখন এ অনুরোধ জানিয়েছিলেন তখন শহীদুল্লাহ্ ছিলেন *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি*-র একজন সদস্য, আর ঠিক সে সময়েই সেই সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন মহম্মদ আকরম খান। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণ হয়তো এর মধ্যেই নিহিত ছিল। অথচ, এই শহীদুল্লাহ্‌ই না কি পরবর্তীকালে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি সুনিশ্চিত করতে রবীন্দ্রনাথকে 'রেফারেন্স পয়েন্ট' হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন—জানিয়েছিলেন তিনি বিশ্বভারতীর 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য' (শাহাদাত ৩৬১)।

এমনভাবেই সাম্প্রদায়িক কুৎসা আর বিরাগের শিকার হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও জীবনে সর্বদাই তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষেই কথা বলে গেছেন। শুধু যে তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবেশের সমালোচনা করেছিলেন তাই নয়, তার আগে ও পরে বার বারই তিনি বিভেদ ও অনৈক্যর প্রতি দেশের নেতাদের দৃষ্টি উন্মীলন করতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন বাস্তবতাকে অস্বীকার করে

ভুয়ো ঐক্য দেখিয়ে রাজনীতি করতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই রবীন্দ্রনাথ এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন:

> ইংরেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই দাঁড় করাইয়া থাকে তবে ইংরেজ আমাদের একটি পরম উপকার করিয়াছে—দেশের যে-একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মতো না বিচার করিয়াই দেশের বড়ো বড়ো কাজের আয়োজনের হিসাব করিতেছিলাম, একেবারেই আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে ... ... যাহা প্রকৃত যেমন করিয়াই হউক তাহাকে আমাদের বুঝিতেই হইবে; কোনোমতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো পন্থাই নাই। (রবীন্দ্রনাথ *রাজা প্রজা* ২৫৩)

এমন নয় যে রবীন্দ্রনাথ গজদন্ত-মিনারে চড়ে শুধুই বাণী দিয়েছেন, আর নিজে কিছুই করেন নি। লর্ড কার্জনের হুকুমনামায় বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই সর্ব-বাঙালির ঐক্য-সাধনের লক্ষ্যে রাখী-বন্ধন উৎসব পালন করেন। সে উৎসবে রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদেরও শামিল করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্ধৃত করে সে বিবরণ আমাদের জানিয়েছেন চিন্মোহন সেহানবীশ:

> ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চার দিকে ভীড় জমে গেল। স্নান সারা হল—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম ... ... হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না ... ... পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম, রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালে—এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। (চিন্মোহন ২)

হিন্দু জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশে যখন রাজনীতিকরা দেশে শিবাজী উৎসব পালন করছেন, কেউ কেউ আবার মুসলমানদের ছায়ায় জল পর্যন্ত পান করছেন না, রবীন্দ্রনাথ তখন এ ভাবেই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা ভেবেছিলেন। শুধু তাই নয়, আমরা জানি পূর্ববঙ্গের 'অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন চাষী আর হিন্দু চাষীদের মধ্যে ৯০% ছিলেন নমশূদ্র'—আর এঁরা অনেকেই ছিলেন হিন্দু অ্যাবসেন্টি ল্যান্ডলর্ডদের শোষণে জর্জরিত। সে কারণেই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা এঁরা করেন নি। বাখরাগঞ্জে নমশূদ্রদের এক সভায় এই ঘোষণা করা হয়েছিল:

> ব্রাহ্মণদের ঘৃণা ও অপছন্দ এবং কায়স্থ ও বৈদ্যদের কারণে বিরাট এই নমশূদ্র সম্প্রদায় পশ্চাৎপদ। অথচ মুসলমান ও তারাই পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং এই সম্প্রদায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তাদের সঙ্গে কাজ করার বরং তারা হাত মিলিয়ে কাজ করবেন তাদের মুসলমান ভাইদের সঙ্গে।

নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ। (রবীন্দ্রনাথ *পরিচয়* ৫২৪)

আশা করি মনোযোগী পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন, ওপরের উদ্ধৃতিতে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের নিরিখে এক অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। ১৯৪৭-এর বিভাজন যেন ১৯১১-তেই রবীন্দ্রনাথ আগাম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—বুঝতে পেরেছিলেন তার কারণও, বুঝেছিলেন হিন্দুরাই ব্যর্থ হয়েছে মুসলমানদের কাছে টানতে। এ প্রসঙ্গে গবেষক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

> আজও পশ্চিমবঙ্গে প্রচারের ধারাটা এমন যে মুসলমানরা পাকিস্তান চাইল বলেই দেশ ভাগ হয়ে গেল। তাদের জানা থাকে না যে, পাকিস্তানের আগে মুসলমানরা চেয়েছিলেন মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। সে অধিকার স্বীকার করা হয়নি বলেই, ওঠে পাকিস্তানের দাবি। (সন্দীপ ১২৩)

'কবি' রবীন্দ্রনাথের মতো বাস্তব রাজনৈতিক বোধ যদি তৎকালীন হিন্দু নেতাদের থাকত তবে হয়তো ১৯৪৭-এর মর্মান্তিক ট্রাজেডি এড়ানো যেত, কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য—রবীন্দ্রনাথের মতো রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি রাজনীতির নেতাদের ছিল না। সে যাই হোক, ইতিহাসের চমৎকার এমনই যে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধই তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর, ১৯৪৪-এর ২৬ জুন ঢাকার পাক্ষিক পত্রিকা *পাকিস্তান*-এ প্রকাশিত হয়, তবে তার শিরোনাম বদলে হয়ে যায় 'Why Pakistan?' (মাহ্‌মুদ ৪০২)—বোঝাই যায়, মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের যে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক অনিবার্যতা এই প্রবন্ধে বোঝানো হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন নামকরণ। বলা বাহুল্য, এ ভাবেই পাকিস্তানপন্থীদের একাংশ রবীন্দ্রনাথকেও তাঁদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু, ১৯৪৭-এর বিভাজনের পরেও যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ খুব জনপ্রিয় ছিলেন তা নয়। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, বাংলা ভাষাই ব্রাত্য হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ 'পাকিস্তানি মানসের বিপরীত' বলে গণ্য হতে লাগলেন, আর বাংলার সঙ্গে উর্দু মিশিয়ে রোমান হরফে 'জাতীয় ভাষা' প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলো। এমনকী, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষের সময়েও পরিস্থিতি খুব অনুকূল ছিল না—মুসলিম লিগের মুখপত্র *দৈনিক আজাদ* রবীন্দ্র-বিরোধিতায় মুখর হয়ে ওঠে আর এমন সব অভিযোগ করে যার সারবত্তা তো নেই-ই, উলটে যেগুলোকে হাস্যকর বলা যায়, যেমন রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু-ভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন বা তিনি 'রামরাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা' ছিলেন। বস্তুত, এই পরিবেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া এমন ভয়ের কাজ ছিল যে শিল্পী সন্‌জিদা খাতুন 'সরকারের অসন্তোষের ভয়ে' মুখের ভেতর রুমাল পুরে গেয়েছিলেন

যাতে তাঁর গলা চেনা না যায় (মুনতাসীর ৫৮-৬০)। তবে, পাকিস্তান সরকারের অসন্তোষ উপেক্ষা করেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রবীন্দ্রানুরাগীর দল রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালন করেছিলেন। সরকারের ভীতি-প্রদর্শন এবং মিথ্যা প্রচার এমন জায়গায় চলে গেছিল যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা-বিভাগ থেকে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস. এম. মুরশেদকে বলা হয় যে ভারতীয় হাই-কমিশন থেকে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষের উৎসবের টাকা দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিচারপতি মুরশেদ জন্মশতবর্ষের উৎসবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, আর 'শত্রু দেশ' ভারত টাকা দিচ্ছে—এমন মিথ্যে অভিযোগ তুলে পাকিস্তানি সরকার তাঁকে ভয় দেখিয়ে ওই উৎসব থেকে সরাতে চেয়েছিল। এর পর যা হলো তা প্রায় অবিশ্বাস্য, বিচারপতি মুরশেদ বললেন তিনি কারো থেকে এক পয়সা চাঁদা না নিয়েই উৎসব পালন করবেন। পরে জানা গেছিল, তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধে পূর্ব পাকিস্তানের ইন্সপেকটর-জেনারেল এ. কে. এম. হাফিজউদ্দিন পুরো টাকাটা তুলে দিয়েছিলেন (আনিসুজ্জামান ৩৭৯-৩৮০)। এভাবেই 'রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তান-বিরোধী'—এমন উদ্ভট ও হাস্যকর অভিযোগের জবাব দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের রবীন্দ্রানুরাগীরা।

তবে এ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ হয় নি। জন্মশতবর্ষের উৎসব-চলাকালীন *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সম্পাদকীয় কলাম থেকে রবীন্দ্রনাথকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়—বলা হয় তিনি হিন্দু ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা, তিনি হিন্দু সাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদের মিত্র, তাঁর লেখায় মুসলমানদের অবমাননা করা হয়েছে, এবং এমনকী তিনি না কি বাংলা ভাষায় পারসিক শব্দের প্রয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন। এমন অভিযোগও তোলা হয় যে মনেপ্রাণে যারা পাকিস্তানি তাঁদের কাছে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান দুই বাংলাকে একত্র করে পাকিস্তানের আদর্শকে নষ্ট করার এক চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয় (আনিসুজ্জামান ৩৮০)। এর উত্তরে মাঠে নামে *দৈনিক সংবাদ* ও *দৈনিক ইত্তেফাক* নামের দুটি পত্রিকা—*দৈনিক সংবাদ*-এর একটি উদ্ধৃতি আমাদের জানিয়েছেন গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের বছরে ২৬ বৈশাখের *দৈনিক সংবাদ*-এ লেখা হয়েছিল:

> পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিটলার, গোয়েবলস, হিমলার ও আইখম্যান শাসিত নাৎসী জার্মানিতে রবীন্দ্র সাহিত্যের সার্বজনীনতা ও মানবপ্রীতির জন্য ১৯৩৫ সালে ইহার প্রচার ও গঠন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। (মুনতাসীর ৬১)

বলা বাহুল্য, এ কথা লিখে *দৈনিক সংবাদ* থেকে এমনটাই বোঝানো হয়েছিল যে একমাত্র ফ্যাসিস্ট অত্যাচারী শাসকরাই রবীন্দ্রনাথকে অপছন্দ করতে পারে। তবু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অপপ্রচার অব্যাহত ছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের

পর ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেন যে সে দেশের ইলেক্ট্রনিক প্রচার মাধ্যমকে জানানো হয়েছে তারা যেন রবীন্দ্রনাথের গানের সম্প্রচার ধীরে ধীরে কমিয়ে দেয় (আনিসুজ্জামান ৩৮১), এর প্রতিবাদে কবি জসীমউদ্দিন রীতিমতো হুমকির সুরে বলেন, 'পূর্ব বাংলার বেতার থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ হলে জনগণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য আকাশবাণী শুনবে' (মুনতাসীর ৬৯)।

এর পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক জগতে দ্রুত পট-পরিবর্তন হতে থাকে—১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, আয়ুব খানের পতন এবং ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতায় এসে সামরিক শাসন জারি, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে মুজিবর রহমানের আওয়ামি লিগের বিপুল জয়, এবং তার পর ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের উদয়। বাংলাদেশের বাঙালিদের এই সংগ্রামের এক মুখ্য হাতিয়ার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর গানের সম্ভার নিয়ে। এ সময়ের কথা লিখতে গিয়ে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, '১৯০৫ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের গানগুলি আবার প্রবলভাবে ফিরে এল' (মুনতাসীর ৭৫)। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের গান জনজীবনে কী বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারে তা সে সময়ে বোঝা গেছিল—অনেকেরই মনে পড়বে এপার বাংলায় আকাশবাণীতেও সে সময়ে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজত, যেমন 'আমার সোনার বাংলা', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'ও আমার দেশের মাটি' এবং আরও অজস্র। এ সব গান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ঠিক যেমন সাড়ে ছ-দশক আগে এ সব গানই উদ্বুদ্ধ করেছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে, এমনভাবেই যুগে যুগে রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালিদের কাছে—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে—যুদ্ধ, আন্দোলন এবং প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যখন নির্বাচিত হলো 'আমার সোনার বাংলা' গানটি, তখন রবীন্দ্রনাথের জয় সুনিশ্চিত হলো।

শেষ কথা

আত্মপরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটা খুব মূল্যবান কথা বলেছেন:

> সকল মানুষেরই 'আমার ধর্ম' বলে একটা জিনিস আছে। কিন্তু সেইটেকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃস্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয়তো সত্য তা নয় ... ... যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার

সাম্প্রদায়িক ধর্ম। সেই সাধারণ পরিচয়েই লোকসমাজে আমার ধর্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার মাথার উপরকার পাগড়ি। (রবীন্দ্রনাথ *আত্মপরিচয়* ১৩৯)

তাহলে 'সাম্প্রদায়িক ধর্ম' মানুষের সত্যিকারের ধর্ম নয়, নেহাতই 'ধর্মগত পরিচয়', এক ধরনের বহির্ভূষণ, কাজের জগতে কাজ চালানোর জন্যে—ঠিক যেমন ইস্কুল-কলেজে ভর্তি হবার সময়ে আমাদের নিজেদের ধর্ম লিখতে হয়—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি। তাহলে মানুষের সত্যিকারের ধর্ম কী? তার হদিশও দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, জানিয়েছেন মানুষের সত্যিকারের ধর্ম হলো 'মাথার ভিতরকার মগজ, যেটা অদৃশ্য, যে পরিচয়টি আমার অন্তর্যামীর কাছে ব্যক্ত' (রবীন্দ্রনাথ *আত্মপরিচয়* ১৩৯)। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, এখানে রবীন্দ্রনাথ আসলে কড়া বিদ্রুপ করেছেন তাঁদের, যাঁরা 'সাম্প্রদায়িক ধর্ম'-কেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়ে 'মাথার ভিতরকার মগজ'-টাকে কাজে লাগান না। আর মগজ কাজে না লাগানোর জন্যেই যাবতীয় গণ্ডগোল, অশান্তি আর সাম্প্রদায়িক হিংসা ও হানাহানি। সন্দেহ নেই যে ব্যক্তি ধর্মের নামে জ্যান্ত মহিলাকে তার মৃত স্বামীর চিতায় উঠতে বাধ্য করেন, যে ব্যক্তি ধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁর লড়াইয়ের সহযাত্রীর ছায়ায় জল খেতে অস্বীকার করেন, অথবা যে ব্যক্তি কল্পিত মুসলমান-বিরোধিতার ধুয়ো তুলে রবীন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির মুসলমান কবির সমগোত্রীয় বলে গণ্য করেন—তাঁরা সকলেই 'মাথার ভিতরকার মগজ'-টাকে সাম্প্রদায়িকতার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিজের মগজ কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন বলেই একযোগে বাঙালি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা আর মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে কোনও পরিস্থিতিতেই 'মাথার ভিতরকার মগজ'-টাকে ভুলতেন না তা আমরা আবার দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' গান প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থান থেকে। ১৯৩৭ সালে জওহরলাল নেহরু 'বন্দে মাতরম' গান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এর আগে এই গানে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তুলে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এ গানকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। আমরা জানি, ১৮৯৬-তে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই গান গেয়ে শোনান, তবু বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম' সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মতামত জানাতে তিনি দ্বিধা করেন নি। ১৯৩৭-এর ২৬ অক্টোবর জওহরলালকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার করেই জানিয়ে দেন যে যদিও এ গানের প্রথম দুটি স্তবক নিয়ে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়, এ গানের পরবর্তী অংশ মুসলমানদের ভাবাবেগে আঘাত দিতে পারে ('liable to be interpreted in ways that might wound Moslem susceptibilities')। আমরা মনে রাখতে পারি, সুভাষচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন যে হিন্দু বাঙালিরা

চায় না যে কোনও কারণেই 'বন্দে মাতরম' গানের অংশচ্ছেদ হোক, কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ এই মতামত জানিয়েছিলেন—জওহরলাল যা মেনেও নিয়েছিলেন। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি হিন্দুদের কাছে প্রবল কটূক্তি শুনতে হয়েছিল। সে কটূক্তির প্রাবল্য এমনই ছিল যে ১৯৩৭-এর ২৮ ডিসেম্বর বুদ্ধদেব বসুকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে যখন জন্মেছেন তখন কটূক্তি তাঁকে শুনতেই হবে (সব্যসাচী ১৮২-১৮৪)।

চিরজীবন 'মাথার ভিতরকার মগজ'-কে কাজে লাগিয়ে যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়ে এসেছেন, তাঁকেই পদে পদে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের সামনে পড়তে হয়েছিল—কখনও হিন্দুদের আবার কখনও মুসলমানদের। এটা যদি আমাদের কাছে আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার চেয়েও বড়ো আক্ষেপের বিষয় হলো রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাকে—বিশেষ করে তাঁর সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ভাবনাকে—বাঙালি হিন্দু সমাজ কখনওই গুরুত্ব দেয় নি। মার্কসবাদী চিন্তক সুশোভন সরকার এ কারণেই আক্ষেপ করে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের 'রাষ্ট্রিক প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির দৃপ্ত তেজ' তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে 'বিশেষ ছাপ রেখে যায় নি' (সুশোভন ৩৮)। এই আক্ষেপই আরও সরোষে জানিয়েছেন সোমেন্দ্রনাথ বসু—বলেছেন 'খোলা মাঠে রাজনীতির তরোয়াল না ঘোরালে দেশকে কেউ সাহসের সঙ্গে সেবা করেছে এ কথা আমরা (পড়ুন হিন্দু বাঙালিরা) ভাবতেও পারি না' (সোমেন্দ্রনাথ ৩)। আর তাই, হিন্দু বাঙালিদের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের যা সমাদর তার সামান্য ভগ্নাংশও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার জন্যে নেই। ছোটোবেলা থেকে আমরা সবাই জেনে এসেছি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে গান গেয়ে চারণ কবির ভূমিকা পালন করেছেন, কিন্তু আমাদের জানানো হয় নি যে এই রবীন্দ্রনাথই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের কুৎসিত অনুপ্রবেশ দেখে সেখান থেকে সরে এসেছিলেন, সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিলেন হিন্দু সমাজের ভ্রান্ত আত্মগর্বকে। সে কারণেই সোমেন্দ্রনাথের আরও আক্ষেপ, 'রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভূমিকার যোগ্য সমাদর এ দেশে হল না' (সোমেন্দ্রনাথ ৩)। যদি হতো, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান যদি হিন্দু বাঙালিরা দেখাতে পারতেন, রবীন্দ্র-নির্দেশিত আত্মশক্তির পথে যদি হাঁটতে পারতেন, যদি শুধু কার্যোদ্ধারের সহায় হিসেবে না দেখে মুসলমানদের আপন বলে ডাকতে পারতেন, তবে হয়তো বাংলার ইতিহাসের মর্মান্তিক এক অধ্যায় রচিত হতে পারত না।

আর তাই, সবশেষে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কথাই সত্যি বলে মনে হয়—হিন্দু বাঙালি সম্প্রদায় রাজনৈতিকভাবে অযোগ্য এবং ভাবাবেগের দিক থেকে অস্থিরচিত্ত (নীরদ সি. ২৫৯)।

উল্লেখপঞ্জি

১। অনিরুদ্ধ রায়: 'ভূমিকা', অনিরুদ্ধ রায় সম্পাদিত *প্রসঙ্গ: মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭-১৮৫৮*, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০।

২। অমর্ত্য সেন: *তর্কপ্রিয় ভারতীয়*, বাংলা সংস্করণ সম্পাদনা কুমার রাণা, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭।

৩। অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী: *পলিটিক্সের ধূলিচক্রে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: ভাষা বিন্যাস, ১৯৯৯।

৪। অশোক বসু: *দি রাইজ অফ সিভিল সোসাইটি ইন বেঙ্গল*, কলকাতা: দি এঁশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২।

৫। আনিসুজ্জামান: 'ক্লেইমিং অ্যান্ড ডিসক্লেইমিং এ কালচারাল আইকন: টেগোর ইন ইস্ট পাকিস্তান অ্যান্ড বাংলাদেশ', ক্যাথলিন এম ও'কোনেল ও জোসেফ টি ও'কোনেল সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ টেগোর: রিক্লেইমিং এ কালচারাল আইকন*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০৯।

৬। কৃষ্ণ কৃপালনি: *টেগোর: এ লাইফ*, নিউ দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৬।

৭। কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসন: *রবীন্দ্রনাথ টেগোর: দি মিরিয়াড মাইন্ডেড ম্যান*, নিউ দিল্লি: রুপা অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০০।

৮। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী*, কলকাতা: অফবিট পাবলিশিং, ২০০৫।

৯। গোপাল হালদার: 'ভূমিকা', বঙ্কিম রচনা-সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড শেষ অংশ, কলকাতা: সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৩।

১০। গোপাল হালদার: 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা', গোপাল হালদার সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ: শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন*, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০।

১১। চিন্মোহন সেহানবীশ: *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

১২। জুডিথ ই. ওয়ালশ: *এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া*, নিউ ইয়র্ক: ইনফোবেস পাবলিশিং, ২০০৬।

১৩। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী: *রচনা সংকলন* (সম্পাদনা পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১১।

১৪। তনিকা সরকার: *হিন্দু ওয়াইফ, হিন্দু নেশন: কমিউনিটি, রিলিজিয়ন অ্যান্ড কালচারাল ন্যাশনালিজম*, ব্লুমিংটন: ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১।

১৫। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত): *রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক: পুলিনবিহারী সেন সংকলিত*, কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।

১৬। দেবব্রত পালিত: *দ্বারকানাথ ঠাকুর*, কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫।

১৭। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী*, সম্পাদনা অসীম আমেদ, কলকাতা: চ্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনাল, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

১৮। নরহরি কবিরাজ: '১৮৫৭ ও বাঙলার বুদ্ধিজীবী', অনিরুদ্ধ রায় সম্পাদিত *প্রসঙ্গ মহাবিদ্রোহ: ১৮৫৭-১৮৫৮* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০।

১৯। নীরদচন্দ্র চৌধুরী: *আত্মঘাতী বাঙালী প্রথম খণ্ড*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৮।

২০। নীরদ সি. চৌধুরী: *অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান*, মুম্বাই: জয়কো পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৪।

২১। পিটার ব্যারি: *বিগিনিং থিওরি: অ্যান ইনট্রোডাকশন টু লিটারারি অ্যান্ড কালচারাল থিওরি*, চেন্নাই: টি. আর. পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।

২২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: *রবীন্দ্রজীবনকথা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

২৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক* [প্রথম খণ্ড], কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

২৪। প্রমদারঞ্জন ঘোষ: 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', অনাথনাথ দাস সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: জন্মশতবর্ষপূর্তি শ্রদ্ধার্ঘ্য*, কলকাতা: বিশ্বভারতী।

২৫। প্রশান্তকুমার পাল: *রবিজীবনী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

২৬। প্রশান্তকুমার পাল: *রবিজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

২৭। প্রশান্তকুমার পাল: *রবিজীবনী*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

২৮। প্রশান্তকুমার পাল: *রবিজীবনী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

২৯। প্রশান্তকুমার পাল: *রবিজীবনী*, সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।

৩০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: *মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত*, বঙ্কিম রচনা-সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড প্রথম অংশ, কলকাতা: সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৩।

৩১। বদরুদ্দীন উমর: *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২।

৩২। বিনয় ঘোষ: *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১।

৩৩। মদনমোহন গোস্বামী (সম্পাদিত): *ভারতচন্দ্র*, নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬১।

৩৪। মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কুরেশি: 'লিটারারি অ্যাসেসমেন্টস অফ টেগোর বাই বেঙ্গলি মুসলিম রাইটারস অ্যান্ড ইনটেলেকচুয়ালস', ক্যাথলিন এম ও'কোনেল ও জোসেফ টি ও'কোনেল সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ টেগোর: রিক্লেইমিং এ কালচারাল আইকন*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০৯।

৩৫। মুনতাসীর মামুন: 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ', সব্যসাচী ভট্টাচার্য সম্পাদিত *পুনশ্চ রবীন্দ্রকৃতি*, নিউ দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১২।

৩৬। যশবন্ত সিং: *জিন্নাহ্: ইন্ডিয়া-পার্টিশন ইন্ডিপেন্ডেন্স,* নিউ দিল্লি: রুপা অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৯।

৩৭। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *পিতৃস্মৃতি,* কলকাতা: জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।

৩৮। রবীন্দ্রনাথ টেগোর: *ন্যাশনালিজ্ম,* নিউ দিল্লি: পেঙ্গুইন বুকস, ২০০৯।

৩৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *আত্মপরিচয়,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), একাদশ খণ্ড, ১৯৮৯।

৪০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *আত্মশক্তি,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯০।

৪১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *কালান্তর,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯০।

৪২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *গোরা,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), সপ্তম খণ্ড, ১৯৮৫।

৪৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *ঘরে বাইরে,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), অষ্টম খণ্ড, ১৯৮৬।

৪৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *চতুরঙ্গ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), অষ্টম খণ্ড, ১৯৮৬।

৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *চারিত্রপূজা,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), একাদশ খণ্ড, ১৯৮৯।

৪৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *জাপান-যাত্রী,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), দ্বাদশ খণ্ড, ১৯৮৯।

৪৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *জীবনস্মৃতি,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), একাদশ খণ্ড, ১৯৮৯।

৪৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান,* নিউ ইয়র্ক: ম্যাকমিলান, ১৯৩১।

৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *পরিশিষ্ট: রাজা প্রজা সমূহ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯০।

৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *পল্লীপ্রকৃতি,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯০।

৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'প্রত্নতত্ত্ব', *ব্যঙ্গকৌতুক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), পঞ্চদশ খণ্ড, ১৯৯৪।

৫২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *ভারতবর্ষ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯০।

৫৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *মন্ত্রী-অভিষেক,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯০।

৫৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), ষোড়শ খণ্ড, ২০০১।

৫৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *রাজা প্রজা,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯০।

৫৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *সমাজ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯০।

৫৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *সমূহ,* রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০-২০০১), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯০।

৫৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'সাহিত্যের শ্রেণীবিচার প্রসঙ্গে', ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক,* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০৩।

৫৯। রানী চন্দ: *আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

৬০। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য: *বাঙালির নতুন আত্মপরিচয়: সমাজ সংস্কার থেকে স্বাধীনতা,* কলকাতা: অবভাস, ২০০৫।

৬১। শাশ্বতী সেনগুপ্ত, শম্পা রায় ও শর্মিলা পুরকায়স্থ: 'মীরজান ফ্রম দি মার্জিন', শাশ্বতী সেনগুপ্ত ও অন্যান্য সম্পাদিত *টুওয়ার্ডস্ ফ্রিডম: ক্রিটিক্যাল এসেইজ অন রবীন্দ্রনাথ টেগোর'স ঘরে বাইরে/হোম অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড,* নিউ দিল্লি: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭।

৬২। শাহাদাত এইচ. খান: 'ডাইভার্জেন্ট ভিউজ অফ টেগোর বাই মুসলিমস ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল, ১৯২৬-১৯৪৭', ক্যাথলিন এম ও'কোনেল ও জোসেফ টি ও'কোনেল সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ টেগোর: রিক্লেইমিং এ কালচারাল আইকন,* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০৯।

৬৩। শিবনাথ শাস্ত্রী : *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ,* কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০৭।

৬৪। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং পঞ্চু', শাশ্বতী সেনগুপ্ত ও অন্যান্য সম্পাদিত *টুওয়ার্ডস্ ফ্রিডম: ক্রিটিক্যাল এসেইজ অন রবীন্দ্রনাথ টেগোর'স ঘরে বাইরে/হোম অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড,* নিউ দিল্লি: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭।

৬৫। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়: *ইতিহাসের দিকে ফিরে: ছেচল্লিশের দাঙ্গা,* কলকাতা: উৎস মানুষ, ১৯৯৩।

৬৬। সব্যসাচী ভট্টাচার্য: *রবীন্দ্রনাথ টেগোর: অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন,* নিউ দিল্লি: পেঙ্গুইন ভাইকিং, ২০১১।

৬৭। সমীর সেনগুপ্ত: *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন,* কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০০৮।

৬৮। সাবির আলি: 'পাশ্চাত্য ইংরাজি শিক্ষা ও বাংলার মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া', অনিল আচার্য সম্পাদিত *অনুষ্টুপ,* বর্ষ ৪৮, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১৪।

৬৯। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়: 'কলকাতার লোকসংস্কৃতির আদিপর্ব', *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০০৮।

৭০। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়: 'কালীঘাটের পট: তৎকালীন সমাজ ও আধুনিক মুল্যায়ন', *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০০৮।

৭১। সুমন্ত ব্যানার্জি: *'দি পেজ্যান্ট ইন ঘরে বাইরে'*, শাশ্বতী সেনগুপ্ত ও অন্যান্য সম্পাদিত *টুওয়ার্ডস্ ফ্রিডম: ক্রিটিক্যাল এসেইজ অন রবীন্দ্রনাথ টেগোর'স ঘরে বাইরে/হোম অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড*, নিউ দিল্লি: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭।

৭২। সুমিত সরকার: *রাইটিং সোশ্যাল হিস্ট্রি*, নিউ দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৮।

৭৩। সুশোভন সরকার: *প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮২।

৭৪। সেমন্তী ঘোষ: 'উপলক্ষ এক, কবির অভিপ্রায় ছিল অন্য', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৭ ডিসেম্বর ২০১১।

৭৫। সৈয়দ মুজতবা আলী: *গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

৭৬। সোমেন্দ্রনাথ বসু: *সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৯৮।

৭৭। হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়: *উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ*, কলকাতা: ফারমা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১।

৭৮। হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী: 'বঙ্গজাগরণ ও বঙ্গভঙ্গ।। ভাণ্ডার: রবীন্দ্রনাথ-কেদারনাথ', সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথ: বাক্‌পতি বিশ্বমনা*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবপ্রকর্ষ চর্চা কেন্দ্র, ২০১১।

৭৯। http://www.hindujagruti.org/news/13248.html, accessed on 22 May 2014.